প্রাণের সুর
ভাওয়াইয়া

খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট

গতিধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
রুমা, হিমেল, সুমেল ও প্রপ্তি

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন

উৎসর্গ

ভাওয়াইয়া যুবরাজ
মরহুম কছিম উদ্দীনকে

ভূমিকা

আমাদের শতশত লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাওয়াইয়া অন্যতম প্রধান বললে হয়তো বেশি করে বলা হবে না। আমাদের সংস্কৃতিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন ঢংয়ের লোকসঙ্গীতের মধ্যে ডুবে থাকি। বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ছড়িয়ে আছে মাটির গান মানুষের গান ভাওয়াইয়া গান। কখনো দেখা যায় গাড়িয়াল বা মইষালের গানই ভাওয়াইয়া আবার দেখা যায় পল্লীবধুর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, উত্থান-পতন, ঘাত-সংঘাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হাসি-কান্না ইত্যাদি এই ভাওয়াইয়ায় যে ভাবে ফুটে উঠে অন্য কোনও লোকসঙ্গীতে তা দেখা যায় না। গ্রামীণ লোক জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম, প্রাপ্তি-ব্যর্থতা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র দিক ভাওয়াইয়ায় বিদ্যমান।

ভাওয়াইয়ার প্রচার প্রসারের জন্য দীর্ঘদিন থেকে চাপ দিতেন ভাওয়াইয়ার উত্তরাঞ্চলের মহান পুরুষ, ভাওয়াইয়া যুবরাজ অগ্রজ, বন্ধু, সাথী মরহুম কছিম উদ্দীন। বেঁচে থাকলে খুবই খুশি হতেন এই বইটি পেয়ে। তিনি সব সময় বলতেন বাওয়া ইয়াকে বেঁচে রাকতে হবে, না হলে একদিন হারিয়ে যাবে লোকালয় থেকে। মাটি ও মানুষের গানকে দখল করে নেবে অন্য কোন দেমের গান। হারিয়ে যাবে আমাদের ভাব ভাষা, হাসি ও কান্না। তাঁর এই আহ্বানের দমল ও "প্রাণের সুর ভাওয়াইয়া"।

এই ভাওয়াইয়া নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁহাদের কথা উল্লেখ না করলে আমার পাপ হবে তাঁরা হলেন- বাংলাদেশের টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার, বন্ধুবর বাবু অনন্তকুমার দেব। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রযোজক জনাব মনজুরুর রহমান (রঞ্জু) ও জনাব বদরুজ্জামান আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও যাঁরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রংপুরের সাপ্তাহিক অটল পত্রিকার সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ও বিশিষ্ট গবেষক সমর পাল, বিশিষ্ট শিল্পী শফিকুল ইসলাম কাঁঠালবাড়ী, আশাফা সেলিম, মাহিনূর আকতার মুক্তা, ডা. মফিজুল ইসলাম, মান্টু, মকসুদার রহমান মুকুল, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, মোঃ সিরাজ উদ্দীন, রেজেকা সুলতানা ফেলী, ইসদাত আরা মণি, রুপু মজুমদার সরলা রানি রায়, এটি এম এনামুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক আমদুন্নার চৌধুরী মানু, আমিনুর রহমান আলম, লুৎফর রহমান বসী, মোজাজ্জেল হোসেন, শফিকুল আলম দুদু স্বর্গীয় অলক করজ্ঞাই বাসু আলেয়া বাদল, রফিকুল ইসলাম পটকা পঞ্চানন রায়, রুনুদ্দৌলা মনা প্রমুখ। এঁদের

অবদানের কথা এই গ্রন্থের প্রকাশ-মুহূর্তে স্মরণ করতে চাই। এঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবপর হতো কিনা সন্দেহ!

আমার এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন আগেই রচিত। সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধা মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন অনুজপ্রতিম কবি সাংবাদিক ও লোকসংস্কৃতিবিদ ড. তপন বাগচীর সঙ্গে। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তপন বাগচী। ভাওয়াইয়ার প্রতি প্রবল ভালবাসার কারণেই তাঁরা আমার পাণ্ডুলিপিকে গ্রন্থরূপ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তানা হলে বইটি হয়তো কোন দিনই প্রকাশ হতোনা। এঁদের দু'জনের প্রেরণা ও সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। বাংলাদেশের সৃজনশীল ও অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা 'গতিধারা'র স্বত্বাধিকারী সিকদার আবুল বাশারের বিশেষ আগ্রহে এ গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভব হয়ে উঠলো। গ্রন্থের জন্য সুন্দর প্রচ্ছদপট অঙ্কনের কৃতিত্বও তাঁর। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে সকল পাঠকের জ্ঞাতার্থে মিনতি করে বলবো এই লেখাতে যদি ভালো কিছু করে থাকি তার সব কৃতিত্ব পাঠকের আর যদি কোনও ভুল করে থাকি তার দায় ভার আমার।

বিনীত

খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৫
ভাওয়াইয়া কি?	০৯
ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি	০৯
ভাওয়াইয়া গানের নামকরণ	১২
ভাওয়াইয়ার অঞ্চল	১৬
ভাওয়াইয়া গানের প্রচার	১৬
ভাওয়াইয়া গানের প্রকারভেদ	১৮
ভাওয়াইয়া গান ও রাগরাগিনী	২১
ভাওয়াইয়া এলাকার বিভিন্ন জাতি ও ভাষা	২২
আদিবাসী :	২৪
বিভিন্ন প্রকার ভাওয়াইয়া উপর কিছু গান	৩৭
ভাওয়াইয়া গানের স্বর্ণযুগ	৫২
ভাওয়াইয়া গানের বয়স	৫৩
মাছের উপর ভাওয়াইয়া	৫৩
পাখির উপর ভাওয়াইয়া	৫৪
বন্যার উপর ভাওয়াইয়া	৫৫
মানুষের নামের উপর ভাওয়াইয়া	৫৬
দেশাত্ববোধক ভাওয়াইয়া	৫৭
ফুলের উপর ভাওয়াইয়া	৫৭
কিছু প্রাচীন ভাওয়াইয়া	৫৮
বৃটিশ বিরোধী ভাওয়াইয়া	৬৩
ভাষা আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারির উপর ভাওয়াইয়া	৭১
প্রাচীন ভাওয়াইয়া	৭৪
তেভাগা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের উপর ভাওয়াইয়া	৯৭
ছোটদের ভাওয়াইয়া	৯৮

ভাওয়াইয়ার গান প্রথম দিকে যারা সমাজের প্রতিকূল পরিবেশেও চর্চা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন	১৬৩
পশ্চিমবঙ্গ ভারত	১৬৩
কুড়িগ্রাম	১৬৩
লালমণিরহাট	১৬৭
রংপুর	১৬৯
নীলফামারী	১৭০
গাইবান্ধা	১৭১
ঠাকুরগাও	১৭২
পঞ্চগড়	১৭২
দিনাজপুর	১৭৩
বগুড়া	১৭৩
রাজশাহী	১৭৩
যশোর	১৭৩
সারা বাংলাদেশের যারা দোতরা চর্চা করেছেন বা করে থাকেন	১৭৩
ভাওয়াইয়া গানের গীতিকার	১৪
সহায়ক গ্রন্থ :	১৭৫

ভাওয়াইয়া কি?

ভাওয়াইয়া নিয়ে আলোচনা করার আগে লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এই লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সঙ্গীত কী সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা আমাদের দেশের যাবতীয় সঙ্গীতকে মূল দু'ভাগে ভাগ করেছেন–মার্গ ও দেশী।

আলাপাদিনিবদ্ধো স চ মার্গ প্রকীর্তি তঃ।
আলাপাদিনিবদ্ধো স চ দেশী প্রকীর্তি তঃ॥

আলাপ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গানকে বলা হয় "মার্গ" আর আলাপ ইত্যাদি বিহীন যে গান তা হলো "দেশী"। 'দেশী সংগীতকে পরিষ্কার বোঝাতে গিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকার বলেছেন–

অবলা বাল গোপালৈঃ ক্ষিতি পালৈর্নিজেচ্ছায়া
গীয়তে সানুরাগেন স্বদেশে দেশীর চ্যতে

-স্ত্রী লোক, বালক, রাখাল ও রাজা নিজের ইচ্ছায় অনুরাগের সঙ্গে নিজ নিজ দেশে যে গান গেয়ে থাকে সেই গানই হলো 'দেশী'। সুতরাং 'দেশী' বলতে আজকে আধুনিক ও 'লোকসঙ্গীত' এর মতো কোনো এক প্রকার সঙ্গীতকে বোঝাত। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারত উপমহাদেশের প্রাদেশিক ভাষায় গান মাত্রই হলো দেশী গান। বিবর্তনের মাধ্যমে এই দেশী সঙ্গীত থেকেই উদ্ভুত হয়েছে লোকসঙ্গীত। বিবর্তন ঘটেছে স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে এবং গীতিকারদের অনুভূতি থেকে এসেছে এই বিবর্তন। (তথ্য সূত্রঃ সুখ বিলাস বর্মা "লোকসঙ্গীতে কোচবিহার। বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা–১৩৯৬, পৃষ্ঠা-৩৫৫।

'লোক' শব্দটির অর্থ আক্ষরিক শিক্ষাবিহীন সরলচিত্ত আধুনিকতার আলো বঞ্চিত গ্রামের জনসাধারণ। পল্লীগ্রামের এই শ্রেণির অখ্যাত কবি, শিল্পী ও সুরস্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, পরিপুষ্ট ও অবিকৃত ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত সংগীতই 'লোকসঙ্গীত' অধিকাংশ সময়েই তাই আঞ্চলিক। কিন্তু বিষয় ভাব ও সুর মাধুর্য্যের গুণে তা বিশেষ অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, গোয়ালপাড়া ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রে ও এ কথা প্রযোজ্য।

ভাওয়াইয়া কথার উদ্ভব যেভাবেই হোক না কেন ভাওয়াইয়া জনপ্রিয় সঙ্গীত রূপে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, গোয়ালপাড়া ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি

ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে তেমন কোনো অনুসন্ধান হয়েছে কি'না আমার জানা নেই। হলেও হয়তো ব্যাপক আকারে হয়নি বলে আমার ধারণা। তবে ভাওয়াইয়া গান যে অতি প্রাচীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চলের গানই ভাওয়াইয়া গান। তরাই

অঞ্চল বলতে হিমালয়ের নিম্নদেশ বা উপত্যাকা অঞ্চল অর্থাৎ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এলাকাকে বুঝায়। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকার গানই ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া আজ সারা পৃথিবীতে একটি সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীত ধারা হিসেবে পরিচিত।

কিংবদন্তি আছে যে, সে সময় যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল গরু বা মহিষের গাড়ি, এই গাড়ি চালককে বলা হয় গাড়িয়াল বা গাড়োয়ান। এই গাড়িয়াল বা গাড়োয়ান যখন একাকী দূর দূরান্তে গাড়ি নিয়ে পরিবহণের জন্য যেত, তখন উদাস উদাত্ত কণ্ঠে নিজে গান রচনা করে সুরারোপ করে যে গান করতো সেই গানই ভাওয়াইয়া গান। এ ভাবেই ভাওয়াইয়া গানের সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, গাড়ি চলার সময় গাড়ির চাকা উঁচু নিচু খাদে পড়ে যে ঝাকুনির সৃষ্টি হতো তাতে গানের সুরে আঘাত করতো। সে কারণেই ভাওয়াইয়া গান ভাংতি সুরে গাওয়া হয়।

অনেক সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ মনে করেন ভাওয়াইয়া গান তরাই অঞ্চলের গান নয়, এ গান সাধারণ মানুষের গান। যারা সারাদিন মাঠে কাজ করতো, অভাবের কারণে দু'মুঠো খাবার জুটতো না, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা ও ভাব। এই ভাব থেকে ভাও আর ভাও থেকে ভাওয়াইয়া সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকি অনেকে বলেন, অবিভক্ত বাংলায় সুখের কোনও কমতি ছিল না। মানুষে মানুষে ছিল খুবই সম্প্রীতি। একে অন্যের সুখে দুঃখে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। জনসংখ্যা কম থাকায় খুব অল্প পরিশ্রমেই সারা বছর খাবার জুটতো তাদের। অর্থাৎ খাল, বিল, নদী নালায় পাওয়া যেত প্রচুর মাছ। জমি জমা ছিল উর্ব্বর। ফসল উৎপাদনের সময় ছাড়া সারা বছর বসে বসেই চলতো তাদের জীবন যাপন। অনেকটা অলস প্রকৃতির মানুষ হিসেবে মনে হয় আজকের যুগের সাথে তুলনা করলে। সেই মানুষগুলো নিজেরাই গান রচনা করে নিজেরাই সুর করে প্রাণ খুলে গান করে আনন্দ লাভ করতো সেই গানই ভাওয়াইয়া।

অপর এক তথ্যে জানা গেছে পল্লীবালার হৃদয়ের কথা, ভালোবাসার কথা দিয়ে যে গান সৃষ্টি হয়েছে তাহাই ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী মনের নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্ত প্রকাশ পেয়েছে।

আবাব অনেকে এও মনে করেন যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ের নৌকার, মাঝিদের গানই ভাওয়াইয়া গান। কোনও এক সময় ঐ মাঝিদের গান পরবর্তীতে বিস্তৃতি লাভ করলেও তা টিকে থাকতে পারেনি। সেই গানই ভাওয়াইয়া গান।

সঙ্গীত বিশারদরা সকলই একমত হয়েছেন যে, ভাওয়াইয়া গান তরাই অঞ্চল অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশীয় গান। এই যুক্তির গ্রহণযোগ্যতাও আছে। কিন্তু প্রশ্ন উদ্ভব হয়, তরাই অঞ্চলে এ গানের উৎপত্তি হলে, তরাই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পায়নি কেন। তাঁরা মনে করেন, না পাওয়ার প্রধান কারণ তরাই অঞ্চলে বসতি কম, সেই কারণে রংপুর দিনাজপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আজকের দিনে যেমন শিল্পী, গীতিকার, সুরকারদের তালিকা থাকছে, রেকর্ড থাকছে, সৃষ্ট সময় তা ছিল না। ছিল না কোনো ভাওয়াইয়া গানের পাণ্ডুলিপি। যার কারণে ভাওয়াইয়া গান মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ

করতে পারেনি। এর কারণ, মুখে মুখে রচনা করে গাওয়া হতো এবং একটা সময় তা বিলীন হয়ে যেত। আরও কারণ হিসেবে দেখা যায় একটি গান সৃষ্টির পর থেকেই সেই গানের কথা, সুর, তাল, লয় প্রতিনিয়ত বদলিয়ে, সে গানটি বিশেষ অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

এক সময় তরাই অঞ্চল বন্ধুর চারণ ভূমিতে সমৃদ্ধ ছিল। প্রচুর মহিষের বাথান দেখা যেতো। যে মহিষ চরিয়ে বেড়াতো বা পালককে বলা হতো মৈষাল বা মইষাল। সূর্য উঠার সাথে সাথে মহিষের বাথান নিয়ে তৃণভূমিতে যাওয়া ছাড়া তাদের কোনো কাজ থাকতো না। কাটতো না তাদের সময়। একাকী নির্জনে তাদের মন বিষিয়ে উঠতো ঠিক ঐ সময় তারা আপন মনে গান বাঁধতো এবং তাৎক্ষণিকভাবে সুরারোপ করে তাল, লয়, বিহীন আপন মনে গান গেয়ে উঠতো। তাদের এই সুর পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসের মধ্যে বিশেষ ধরনের কম্পনের সৃষ্টি করতো, যার কারণে এ গানের গায়কের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারিত হতো বা এখনো হয়। এই মৈষাল বা মইষালদের কাছ থেকে ভাওয়াইয়া গানের সৃষ্টি। যার জন্য আজও ভাওয়াইয়া গান ভাঙ্গতি সুরে গাওয়া হয়।

অনেকে বলেন ভাওয়াইয়া গানের আদি উৎপত্তি স্থল চীন-তিব্বত এলাকায় যা, পরবর্তীতে তরাই অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, ভাওয়াইয়া গানে তিব্বতী-চীনা ভায়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেকে মনে করেন ভাওয়াইয়ার জন্ম সেখানে নয় এমনো হতে পারে তিব্বতী-চীনা ভাষী কোনও পরিবার ভাওয়াইয়া গান প্রসারের কাজে লিপ্ত ছিল। যুক্তি হিসেবে তারা বলেছেন, ভাওয়াইয়া গানে এমন কিছু শব্দ বা বাক্য আছে যাতে তিব্বতী-চীনা ভাষা বিরাজমান। যেমন গেইলং, খাইলং, কইলং ইত্যাদি। নিম্নের গান দু'টোতে আমরা দেখতে পাবো।

প্রেম জানে না রসিক কালা চাঁদ কালা বুঝিয়া থাকে প্রাণ
কত দিনে বন্ধুর সাথে হব দরিশন বন্ধু হে
বন্ধুরে--
নদী ওপারে তোমার বাড়ি যাইতে আসতে অনেক দেরি
হাটিয়া যাইতে নদীর পানি
থাকলাউ কি খুকলাং কি খাল্লাউ খাল্লাউ করেরে
হায় হায় প্রাণের বন্ধুরে॥

অথবা

গুর গুরিয়া ডাকে দেওয়া আইলো মরার ঝরি
পতি গেইছে অমপুর শহর এ্যালাও না আইল বাড়িরে
ও দেওয়া তোর পাও ধরংরে।
বিয়ানে উঠি পতিধন মোর খালি পেটে গেইছে
ভাত আন্দি মুই বসি আছোং
ও তাই দিনম্যান ধরি রে॥

আবার অনেক সঙ্গীত বিশারদ মনে করেন যে, গান মানুষ মুখে মুখে রচনা করে বিভিন্ন সুরে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাহাই ভাওয়াইয়া। তারা কারণ হিসেবে বলেছেন, প্রাচীন গানগুলো যেভাবে বা যে সুরে গাওয়া হতো বা এখন হচ্ছে, সৃষ্ট সময় তার ভাষা, সুর, তাল, লয়, উপস্থাপনা আজকের মতো ছিল না। রচয়িতা যেভাবে রচনা করেছেন পরবর্তী গায়ক বা ধারক তার নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মতো গেয়ে গানটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভাওয়াইয়া গানের নামকরণ

মহা মহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন বলেছেন "বোধকরি পূর্বরাগ লইয়াই প্রথম ভাওয়াইয়া গান সৃষ্টি হইয়াছে। সে জন্য ভাব শব্দের প্রাকৃত ভাও রাজবংশী ভাষায় ভাওয়াইয়া নামের নামকরণ হয়েছে। অর্থাৎ ভাওয়াইয়া বা ভাওইয়া শব্দটি প্রাকৃত "ভাও" যার অর্থ ভাব এবং সংস্কৃত আওয়াই অর্থাৎ জনরব ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের রূপ নিয়েছে। যে গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটিয়ে তোলে প্রাণের আবেগ ও আকাঙ্খাকে, শ্রোতার জন্য প্রতীক্ষা না করে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছে তাহাই ভাওয়াইয়া।

ভাওয়াইয়া আলোচনায় স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে- 'ভাওয়াইয়া' শব্দের অর্থ কী? এ সম্পর্কে স্বর্গীয় সুরেন রায় মহাশয়ের অভিমত হলো ভাবপূর্ণ যে গীত মানুষকে ভাববিহ্বল করে দেয় তাই 'ভাওয়াইয়া'। ভাব> ভাও+ইয়া=ভাওইয়া তাই ভাওইয়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যে ভাবে' অর্থাৎ ভাবুকের গান। যেমন আমাদের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর রংপুরে, যে খায় তাকে খাওয়াইয়া, যে যায় তাকে যাওয়াইয়া বলে সম্বোধন করা হয়। এই গান জল-ভাতের মতো এত সরল ও স্বাভাবিক যে, গাওয়ার সঙ্গেই ভাব বোঝা যায় এবং একেবারেই আধুনিক হেঁয়ালী বর্জিত। যে জন্য এই গানের নাম হয়েছে ভাওয়াইয়া অর্থাৎ automatic গান বা ক্ষুদ্রতম শিল্প, সুর ও ছন্দের স্বাভাবিক বিকাশ। যখন মানুষ ভাবতে শিখেছিল বা সুর ছন্দে যা ভেবেছিল তখনই তার ভাবধারা হতে এর উৎপত্তি হয়েছিল।

প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া গবেষক গৌরীপুর (গোয়ালপাড়া) নিবাসী শ্রী শিবেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল মহাশয়ের মতে 'ভাব শব্দ হতে ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি হলেও এখানে 'ভাব' শব্দ অন্য অর্থ বহন করে।

গোয়ালপাড়া জেলায় (আসাম, ভারত) ভাব শব্দ প্রেম বা ভালোবাসা শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। নরনারীর প্রেম সম্বন্ধীয় হওয়ার জন্য ঐ সকল গানের নাম ভাওয়াইয়া হওয়াও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যদি ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি ভাব শব্দ হতে না হয়ে থাকে এবং শব্দটি তদ্ভব শব্দ না হয়ে খাঁটি দেশজ শব্দ হয়ে থাকে তা হলে ভাওয়াইয়া শব্দে অর্থ অন্যরূপ হতো। ভাওয়াইয়া গান বলতে যে গান মনকে উদাস করে বা মনকে ঘরছাড়া করে সেই গানকে বুঝাবে। সুতরাং ভাওয়াইয়া গানের অর্থ 'মনকে উদাস করা গান' হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ভাওয়াইয়া শব্দের অর্থ উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক যতীন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া সংগ্রাহক আব্দুল করিম সাহেবের অভিমত উল্লেখ করেছেন। অনেক ভাওয়াইয়া শিল্পীর সঙ্গে

তিনি একমত যে, 'ভাওয়াইয়া' গানের জন্ম 'ভাওয়া' শব্দ থেকে। 'ভাওয়া' মহিষের চারণ ক্ষেত্র, মরা নদীর দোলা জমিতে জাত মধুয়া কাশিয়ার বন। 'ভাওয়া' অর্থাৎ মহিষের চারণ- ক্ষেত্র। মহিষের রাখালেরা (মইষালেরা), মাসের পর মাস মহিষ চরিয়ে বেড়ানোর সময়ে মহিষের পিঠে বসে দোতরা বাজিয়ে এ গান করতো। গানের উৎস স্থান 'ভাওয়া' থেকে এ গানের নাম ভাওয়াইয়া হয়েছে।

আবার অনেকের মতে ভাওয়াইয়া কথাটি বিকৃত/বিবর্তিত হয়ে 'বাওয়াইয়া' থেকে এসেছে। বাও মানে বাতাস। মৈষালের গানের সুর মধুয়া কাশিয়ার বন থেকে চাষিদের গাওয়া গানের সুর, পাতার (ফাঁকা মাঠ) থেকে বাও বাতাসে ভেসে লোকালয়ে আসত। সেই জন্য এই গানের নাম হয়েছে বাওয়াইয়া যার পরবর্তীতে ভাওয়াইয়া নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

'ভাব' 'ভাওয়া', 'বাও' ইত্যাদি কোনও শব্দ থেকে ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। ভাওয়াইয়া নামে উৎপত্তি যে ভাবেই হোক না কেন, এই সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ভাওয়াইয়ার একটি গ্রহণযোগ্যতা সংজ্ঞা হতে পারে– ভাওয়াইয়া রাজবংশী বা কামরূপী ভাষায় গীত দীর্ঘ ছন্দের ও বিলম্বিত তালের লোকসঙ্গীত যার মাধ্যমে পাওয়া যায় রাজবংশীদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ও লোকায়ত জীবনের অভিব্যক্তি।

ভাওয়াইয়া বলতে তাই দরিয়া সুরের গানগুলোকে বোঝায়। পরবর্তীকালে তার মধ্যে চটুলতা আসে ধীরে ধীরে 'চটকা' রূপে সেগুলো গীত হতে থাকে। অন্য যে কোনও আঞ্চলিক সঙ্গীতের মতো এর নিজস্বরূপ, ঠং ও রং আছে। ভাওয়াইয়া বিশুদ্ধি নির্ভর করে রাজবংশী ভাষায় ভাষাজ্ঞান, সুষ্ঠু উচ্চারণ ও কণ্ঠধ্বনি নৈপুণ্য এবং সেই জন্য রাজবংশী ভাষা অঞ্চলের বাইরের গায়কের পক্ষে শুদ্ধভাবে ভাওয়াইয়া গান করা দুঃসাধ্য। ভাওয়াইয়া আঞ্চলিক সঙ্গীত। আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ভাষা। আঞ্চলিক জবান অর্থাৎ রাজবংশী উপভাষা ভাওয়াইয়ার বাহন। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক এই উপভাষার নাম আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল যার সঙ্গে বাংলার অন্য অঞ্চলের কথ্য ভাষা কিংবা বাংলার সাধারণ সাহিত্যিক ভাষার কোনও মিল নেই। এই ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিও স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের ভাষা সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা দেখতে পেয়েছেন যে, এই ভাষা সম্প্রদায়র একটা বড় অংশ মোঙ্গল নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই নরগোষ্ঠীর আদি ভাষা ছিল, ভোটচীনা ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনি তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তাই এই অঞ্চলের উচ্চারণে ভোটচীনা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও কিছু কিছু প্রত্যয় ব্যবহারের প্রতিবেশি অসমীয়া ভাষার সঙ্গেও এর যোগাযোগ খুব বেশি। সুদুর অতীতে এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষই সম্ভবত ভোটচীন ভাষায় কথা বলতো। পরে ভারতের অন্য অংশের বিভিন্ন জাতীয় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে এখানে ভারতীয় আর্য ভাষার প্রসার ঘটতে থাকে, যদিও ঠিক কোন সময়ে এটা ঘটে তা নিশ্চিত বলা কঠিন তবে এই উপ-ভাষার সর্বাংশই আর্য ভাষার অধীন নয়; এর ধ্বনি তত্ত্বে কোথাও কোথাও রূপ তত্ত্বে, বিশেষত শব্দ ভাণ্ডারে আর্যেতর উপাদান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। আর্য ভাষার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার আকর্ষণ অস্বীকার করতে না পারলেও এ অঞ্চলের মানুষ তাদের উচ্চারণ ভঙ্গির আদি বৈশিষ্ট্য, পুরাতন ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ ভাণ্ডারের একটি অংশ, পদ প্রয়োগের সিদ্ধরীতি। এগুলো একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি। প্রধানত আর্যতর

উপাদানের সমৃদ্ধ এ ধরনের একটি উপভাষাই (তাকে রাজবংশী বা কামরূপি যাই বলা হোক না কেন) ভাওয়াইয়ার বাহন। অখ্যাত, অজ্ঞাত, নিরক্ষর কবি শিল্পী দ্বারা উপরোক্ত উপভাষায় রচিত এ গানগুলো অনাদিকাল থেকে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। স্বভাবত কিছু কিছু রূপান্তর বিশেষ করে কথা রূপান্তর ঘটেছে অনিবার্য্যভাবেই। অনেক সময়ে হয়তো ভাষাতে মিশ্রণ এসেছে কিন্তু গানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে রাজবংশী ভাষাতেই। বিষয়গত দিক থেকে এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠেছে। একটি গ্রাম্য অনগ্রসর কৃষিজীবী নৃগোষ্ঠীর (প্রধানত রাজ বংশীর) আর্থ সামাজিক জীবনের মূল বৈশিষ্ট।

অন্যান্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের মতো ভাওয়াইয়াতেও প্রেম বিষয়ক গানই বেশি। কিন্তু প্রধান বিশেষত্ব হলো গানের মধ্যে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত করার সরল ও অকপট প্রয়াস। নর-নারীর জীবনে যত কম রকম পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে তা সবই এই প্রেম বিষয়ক গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নারী পুরুষের চিরন্তন ভালোবাসার কথাতো আছেই। স্বামী যৌন ক্ষমতাহীন হওয়ার জন্য নারী মনের ক্ষোভ, বিধবা নারীর প্রেমাসক্তি অবৈধ প্রণয়, বাল্য প্রেমের অসহনীয় যন্ত্রণা, পরকীয়া প্রেম– এ সব কিছুর সরল ও অকপট প্রকাশ ঘটেছে এই ভাওয়াইয়াতে।

কৃষি ও কৃষকের এ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সমগ্র জাতির অন্ন সংস্থান করে কিন্তু কৃষকের চিরকালই সমাজ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। এ কৃষির উপর ভিত্তি করেই ভাওয়াইয়ার জন্ম ও লালন পালন। এ প্রসঙ্গে ভাওয়াইয়ার প্রাণ পুরুষ আব্বাস উদ্দিনের নিজের কথায় "বাড়ির পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। আমাদের আধিয়ারী প্রজারা হাল বাইতে বাইতে পাট নিড়াতে নিড়াতে গাইতো ভাওয়াইয়া গান .... সেই সব সুরই আমার মনের নীড়ে বেঁধেছিল ভাওয়াইয়া গানের পাখি"।

রিমিঝিমি বৃষ্টিতে হাল চালাতে চালাতে অথবা ধান পাট ক্ষেত নিড়ানীর কাজ চলা কালীন প্রায় সবার কণ্ঠেই শোনা যায় ভাওয়াইয়া, কণ্ঠে সুর থাকুক বা না থাকুক। কাজের তালে তালে শুরু হয়ে যায়–

ও ধন মোর কানাইয়ারে,
এ্যালুয়া কাশিয়ার ফুল, নদী হইছে কানাই হুলুস্থুলরে,
ক্যামন করিয়া দরিয়া হবো পার,
ধন মোর কানাইয়ারে॥

অথবা

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
ফান্দ বসাইছে ফান্দি ভাইয়া পুঁটি মাছ দিয়া
পুঁটি মাছের লোভে বগা পড়ে উড়াও দিয়ারে॥
ঐ গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশের ক্ষেত থেকে অন্য কেউ গান ধরে–
আগা নাওয়ে ডুবো ডুবো পাছা নাওয়ে বইসো
ঢোঙায় ঢোঙায় ছ্যাক্ও জলরেঃ
ও কইন্যা পাছা নাওয়ে বইসো॥
....................ইত্যাদি।

কেউ হয়তো শুরু করতো, "ওকি গাড়িয়াল ভাই, হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারীর বন্দরে"। সে গান শেষ হতে না হতেই অন্য কেউ ভাঙ্গা গলাতেই শুরু করলো, "ও মোর কাগারে কাগা কন কাগা মোর মাও বা কেমন আছেরে, যখন মাও মোর আন্দে বাড়ে---ইত্যাদি।

আবার প্রবীণ ভাওয়াইয়া শিল্পীদের বলতে শোনা যায় কাশ ও নলখাগড়ার বিস্তীর্ণ চরকে ভাওয়া বলা হয়। আর এই 'ভাওয়া' থেকে ভাওয়াইয়া কথাটি এসেছে। কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন কাশবন ও নলখাগড়া নিয়ে অনেক ভাওয়াইয়া গান গাওয়া হয়ে থাকে।

হামরা বোলে মৈষলরে
দেড় টাকার চাকুরি করি হামরা নোহাই ভাল্
নল খাগড়ার উড্ডার ঘুতায়
হাটুয়ার গেল ছালরে॥

অথবা

ও মুই না শোনোং না শোনোং
তোর বৈদাশীর কথারে ও মোক ছাড়িয়া গেলু ক্যানে।
আইলে আইলে আইল কাশিয়া গাত পড়ে ঢুলিয়া
ও তুই আসিবু বলিয়া গেলু যে ছাড়িয়া এ্যাকেলায় ফেলেয়ারে
ও মোক ছাড়িয়া গেলু ক্যানে॥

বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, লেখক ও গবেষক বাবু সুকুমার রায় তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ভাওয়াইয়া দোতরার গান স্বরূপ বর্ণিত হয়। ভাওয়াইয়া শব্দটি কেউ কেউ ভাবগীতির অর্থে ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশের বেতার রংপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন উপ-মুখ্য প্রযোজক জনাব সিরাজ উদ্দিনের কাছ থেকে জানা গেছে, তিনি তাঁর ওস্তাদের কাছে শুনেছেন 'উত্তরাঞ্চলের বিরহী বালার উচ্চ কণ্ঠে নিঃসৃত আবেগপ্লুত কণ্ঠের গানই ভাওয়াইয়া'। তিনি জানান উত্তরাঞ্চলের কথা, ভাষা, ভাও, য়াইয়া থেকে এ গানের জন্ম বা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন উত্তরাঞ্চলের ভাষা ছাড়া অন্য কোনও এলাকার ভাষা খুব একটা ভাওয়াইয়া গানে দেখা যায় না। অবশ্য ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিনের গানে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়

তিনি আরো বলেন, উত্তরাঞ্চলের ভাষায় 'ভাও' অর্থ মূল্য যেমন কথায় কথায় অনেককে বলতে শোনা যায় লোকটার ইদানিং খুব 'ভাও' অর্থাৎ মূল্য বা দাম হয়েছে। আর য়াইয়া অর্থ ব্যক্তি অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলে যে বলে তাকে বলাইয়া, যে শেখায় তাকে শেখাইয়া বলা হয়। অনেক গানে তা লক্ষ করা যায় যেমন–

"তোমরা কেমন কওয়াইয়া
মন কাড়িয়া নিছেন তোমরা কয়া ভাওয়াইয়া"॥

ভাওয়াইয়া গান এই মূল্য ও ব্যক্তি হতে সৃষ্ট এবং এই জন্য ভাওয়াইয়া নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন এই ভাওয়াইয়া গান এক সময় খুবই মূল্যবান গান ছিল। দর্শক শ্রোতারা ভাবতো এবং জানতো, সঙ্গীত জগতে ভাওয়াইয়া গানই এক মাত্র গান। এ গান সবাই গাইতে এবং করতে পারে না। কোনও এক সময়

ভাওয়াইয়া গায়কদের অত্যন্ত উচ্চমানের গায়ক হিসেবে ধরা হতো। সমাজে তাদের স্থান ছিল অন্য দশজন গায়কের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। অবশ্য এখন তা গ্রহণযোগ্য নয় বরং উল্টোটাই হয়ে থাকে।

ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিনের পুত্র, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর প্রাক্তন মহা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক সময়কার উপস্থাপক, বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পী জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী বেতার বাংলা জানুয়ারি-মার্চ ৯৮ পত্রিকায় লিখেছেন। মেঠো সুরের গান বলতেই বুঝায় ভাওয়াইয়া গান। তিনি আরো লিখেছেন নারী বিরহের আকুতি, বেদনাহত নারীর ক্রন্দনই ভাওয়াইয়া। ভাব থেকে ভাওয়া অথবা ভাব-য়াইয়া থেকে ভাওয়াইয়া গানের নামকরণ করা হয়েছে।

রংপুরের বিশিষ্ট প্রবীণ নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ডা. আশুতোষ দত্ত খুবই জোর দিয়ে বলেন ১৭৮৩ খ্রিঃ নবাব নূর উদ্দিন, ভবানী পাঠক ও মন্থনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদের বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তারা শত্রুর মোকাবেলা করতে তৎকালীন একমাত্র দ্রুত যানবাহন হিসেবে নৌকা ব্যবহার করতেন। ছিপ নৌকা ব্যবহারে এরা ছিল সিদ্ধহস্ত। উক্ত ছিপ নৌকার স্থানীয় নাম ছিল ভাওয়াইল্লা। আর এই ভাওয়াইল্লা পরবর্তীতে হয়েছে 'ভাউলা'। উল্লেখিত ভাওয়াইল্লার মাঝিতে গীত সঙ্গীত 'ভাওয়াইয়া' নামে পরিচিত লাভ করে।

তিস্তা, করতোয়া, ধরলা ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাওয়াইল্লা অর্থাৎ ছিপ এবং স্থলের বাহন একমাত্র গো মহিষের গাড়ি। তাই ভাওয়াইয়া গানে এই দ্বিবিধ যানবাহনের চলার গতি ও খাদ নির্ভর সুর ভাওয়াইয়া গানে বিধৃত।

ভাওয়াইয়ার অঞ্চল

এখন যদিও ভাওয়াইয়া গান বাংলা ভাষাভাষী এলাকা ছাড়া পৃথিবীর যে কোনও দেশে গাওয়া হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে ভাওয়াইযার অবস্থান ব্যাপক না হলেও একটি বিশেষ অবস্থানে স্থান করে নিয়েছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। অনেক সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ মনে করেন ভাওয়াইয়া অঞ্চল বলতে রংপুর দিনাজপুর এলাকাকেই বুঝায়। আসলে তা সঠিক নয়। কেননা ভাওয়াইয়া গান তরাই অঞ্চলের গান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর রংপুর দিনাজপুর এলাকা তরাই অঞ্চল অবশ্যই নয়। তাহলে তরাই অঞ্চলের সমগ্র অঞ্চল সংগত কারণে ভাওয়াইয়ার অঞ্চল হিসেবে ধরে নেয়া যায়। তরাই অঞ্চল ছাড়াও ভারতের মালদহ, আস্সাম, পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, গোয়ালপাড়া অঞ্চল অর্থাৎ আসাম, বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর রাজশাহী ও ময়মনসিংহের কিছু এলাকা ভাওয়াইয়া গানের অঞ্চল হিসেবে ধরলে ভুল হবে না।

ভাওয়াইয়া গানের প্রচার

পশ্চিমবঙ্গ কোচবিহারের প্রখ্যাত লেখক, খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা সাহেবের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, ভাওয়াইয়া অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গীতের মতো অনাদিকাল থেকে গীত হয়ে আসছে। হয়তোবা ভাওয়াইয়া নামে নয় মৈষালী বা অন্য কোনো নামে। কিন্তু বাইরে জনগণের কাছে এই গান প্রচার লাভ শুরু করে তিরিশের দশক থেকে

গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। তিরিশের দশকে এ অঞ্চলে কিছু প্রতিভাধর শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় দিতে সাহায্য করে আধুনিক গ্রামোফোন রেকর্ড। যার মাধ্যমে ভাওয়াইয়া গান লোকসমক্ষে পরিচিতি লাভ করে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ সঙ্গীত ধারা মাধ্যমে ভাওয়াইয়া গান লোকসমক্ষে পরিচিতি লাভ করে এবং কোন পথে যাবে সেই দিক নির্ণয়ের সাহায্য করে।

বস্তুতপক্ষে, গ্রামোফোন রেকর্ড ধরা না থাকলে এর অধিকাংশই গানই আজ হয়তো হারিয়ে যেত বা অপরিচিত থেকে যেত। আবার মুখে মুখেও যদি পাওয়া যেত তার সুর, তাল বিকৃত হয়ে আংশিক টিকে থাকতো। এই গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে ভাওয়াইয়াকে ধরে রাখার ব্যাপারে এবং গ্রামীণ শিল্পীদেরকে লোকসমক্ষে তুলে ধরার ব্যাপারে গ্রামোফোনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। গ্রামোফোন কোম্পানির মাধ্যমে যার অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য এ কাজ সম্ভব হয়েছে, তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) কোচবিহার নিবাসী স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র পাল মহাশয়। স্বর্গীয় পাল মহাশয়ের কাছে ভাওয়াইয়ামোদীরা বিশেষ ভাবে ঋণী।

যে শিল্পীদের প্রতিভার ফলস্বরূপ আমরা বর্তমান ভাওয়াইকে পাই তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ধারাকে গ্রামোফোনে স্থান দিতে প্রথমে আসেন কোচবিহার শহর ও শহরতলীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। গ্রামীণ শিল্পীরা আসেন অনেক পরে।

যতদুর জানা যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ রায় বসুনিয়া ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে "বাড়িতে নতুন বউ আসিয়া ও পরশী আপন নয় বান্ধবরে" গান দু'টি প্রথম রেকর্ড করেন এবং সেই থেকেই ভাওয়াইয়া গান দেশ বিদেশে, গ্রামে গঞ্জে প্রচারের যাত্রা শুরু করে। ঐ রেকর্ড সারা ভারতবর্ষে নতুন করে সাড়া জাগায়। ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিনের বন্ধু ও গুরু স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ রায় বসুনিয়া আব্বাস উদ্দিনকে ভাওয়াইয়া গান করার অনুরোধ জানান।

তখন আব্বাস উদ্দিন যিনি সেই সময় নজরুল গীতির অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অনুরোধে নজরুল গীতির অনুশীলন কমিয়ে দিয়ে ভাওয়াইয়া ও পল্লীগীতির দিকে ঝুকে পড়েন। একে একে অনেক ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করে সমগ্র দেশে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পিপাসুদের মাঝে সুদৃঢ় অবস্থান করে নেন। (তথ্য সূত্র: মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা-১৩৯৬, পৃষ্ঠা ৩৭০)

ভাওয়াইয়া গানের ঐ রেকর্ডগুলোর সুনাম সুডাকে তারপর একে একে গ্রামের দক্ষ গীদালগণ এগিয়ে আসেন রেকর্ড করতে। অবশ্য হরিশচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্র নাথ রায় বসুনিয়া ও আব্বাস উদ্দিন মহোদয়ের গান গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেললে হয়তো পরবর্তী কোনও শিল্পীর পক্ষে রেকর্ড করা সম্ভব হতো না বা রেকর্ড কোম্পানিও আগ্রহ প্রকাশ করতো না।

চল্লিশের দশক থেকে যেই সব শিল্পীদের আমরা দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গে এদের মধ্যে বিখ্যাত সর্ব জনাব নায়েব আলী টেপু, কেশব বর্ম্মণ, প্যারীমোহন দাস, গঙ্গাধর দাস, যত্নেশ্বর বর্ম্মণ, ধনেশ্বর রায়, কেদার চক্রবর্তী, বিরজা মোহন সেন প্রমুখ। শেষোক্ত দু'জন অবশ্য গিদাল ছিলেন না। গ্রামীণ গীদাল শিল্পীদের প্রত্যেকের কণ্ঠ ছিল স্বকীয়তায় ভরা। এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে ছিলেন স্বর্গীয় নায়েব আলী টেপু ও স্বর্গীয় কেশব বর্ম্মণ। আবার শিল্পী ও গীতিকার হিসেবে যিনি সব চেয়ে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন প্যারীমোহন দাস। মরহুম আব্বাস উদ্দিনের বাল্যবন্ধু।

ভাওয়াইয়া স্বকীয়তা রক্ষায় সংগ্রাম করেছেন শ্রী দাসের মতোই শিল্পী। যন্ত্র শিল্পী এবং গীতিকার হিসেবে ভাওয়াইয়া পুষ্টি সাধন করেছিলেন স্বর্গীয় কেশব বর্ম্মণ। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডে মরহুম আব্বাস উদ্দিনের সঙ্গে দোতরা শিল্পী হিসেবে প্রবেশ করেন। পরে নিজে শিল্পীর ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় পাঁচশতের মতো ভাওয়াইয়া গান এবং ২৬ খানি নাটক রচনা করেন। মূল গীদালের ভূমিকায় বিষহারা পালা তার প্রধানতম কৃতিত্বের সাক্ষর। মূলত মনসা মঙ্গল, পৌরাণি ধর্মীয় কিছু পালাগান সে সময় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সেই সময়কে পালাগানের স্বর্ণ যুগ বললে ভুল হবে না।

ভারতের আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া জেলার খেরবাড়ি গ্রামে জন্মান্ধ মহান শিল্পী টগর অধিকারীর জন্ম ১৯১২ সালে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম কোচবিহার জেলার রাজার কুঠির প্রিয়নাথ রায় যিনি প্রিয়নাথ ওস্তাদ নামে পরিচিত ছিলেন- তাঁর কাছেই গান ও বাজনার হাতে খড়ি। অল্প দিনের মধ্যে দোতরায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ বর্সুনিয়ার সাথে রেকর্ডেও তিনি দোতরা বাজান। সারা ভারত যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত), কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত সংস্কৃতি সম্মেলনে ও শান্তি উৎসব প্রভৃতিতে দোতরা বাদক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। দোতরায় বিভিন্ন রাগ রাগিনী বাজিয়ে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করেন। অবশ্য দোতরার ডাং (Strok) এর চরম রসাবেদন মূর্ত হয়ে ওঠে ভাওয়াইয়ার সুরেই। এখানে উল্লেখ করতে হয়, তার বিখ্যাত সুর সৃষ্টি 'বিয়ের আসরের বাজনা'। বিয়ের মণ্ডপে মেয়ে কাঁদছে, মেয়ের মা কাঁদছে, আসন্ন কন্যা বিদায়ের জন্য, সঙ্গে উলু ধ্বনি, ঢাকের আওয়াজ ও সানাইয়ের বেহাগ সব কিছু মিলিয়ে জীবনে বিয়ে বাড়িতে যে সুর বেজে উঠে তারই হুবহু প্রকাশ ছিল তার সৃষ্ট অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনায়।

এখনও অনেকের কাছেই শোনা যায় দোতরার এই বিখাত শিল্পীর দারিদ্র তাড়িত জীবনের কথা। যার দোতরার সুরমূর্চ্ছনায় একদিন পণ্ডিত রবিশঙ্কর মুগ্ধ হয়েছিলেন। চরম দারিদ্রের মধ্যে সে প্রতিভা একদিন নীরবে নিভৃতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঐ খেরবাড়ি গ্রামেই।

ভাওয়াইয়া গানের প্রকারভেদ

বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত জনাব হাবিবুর রহমান লিখিত' বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগলিক পরিবেশ, গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভাওয়াইয়া গান তিন প্রকার যথা; ভাবমূলক, চটকা ও ক্ষিরল। ভাওয়াইয়া গানে এই তিন ধরনের গান আছে তা গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও ভাওয়াইয়া গান তিন প্রকার, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ভাওয়াইয়া গানের মূল নায়ক মৈষাল, দীঘলনাশী ও বিচ্ছেদী ভাওয়াইয়ার করুণ বর্ণনা যে এ গানে আছে তা বর্ণনা করা হয়নি।

ভাওয়াইয়া গান কত প্রকার তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় ভাওয়াইয়া গান মূলত ছয় প্রকার

১. দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া
২. চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া
৩. ক্ষিরল ভাওয়াইয়া
৪. বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া

৫. মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া
৬. মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া

দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া

দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়াকে অনেকে টানা ভাওয়াইয়াও বলে থাকেন। এ ভাওয়াইয়া উদাস উদাত্ত্ব কণ্ঠে গাওয়া হয়ে থাকে। গানের সুর অবশ্যই উদারা বা মুদারা সপ্তকে শুরু হলে তা, তারা সপ্তকের দিকে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্কেলে বেশ কয়েক মাত্রা দাঁড়িয়ে থাকে। আর সুরে থাকার সময় একটি বিশেষভাবে ভাংতি দেয়া হয় বা ভাংতি সুরে গাওয়া হয়। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ মনে করেন যেহেতু ভাওয়াইয়া গান হিমালয়ের পাদদেশে সৃষ্টি হয়েছে সুরের ধ্বনী পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হতো এ কারণেই এ গান ভাংতি সুরে গাওয়া হয়। দীঘলনাশী ভাওয়াইয়া আবার দুই প্রকার যথা :

(ক) ভাবমূলক
(খ) আবেদনমূলক।

ভাবমূলক দীঘলনাশী ভাওয়াইয়া: ভাবমূলক দীঘলনাশী ভাওয়াইয়া ভাবের কথা প্রকাশ্যে ফুটে উঠে। যা মানুষকে ভাবের জগতে বিচরণ করায়।

আবেদনমূলক দীঘলনাশী ভাওয়াইয়া: আবেদনমূলক দীঘলনাশী ভাওয়াইয়ায় নারী পুরুরে আবেদন এমনভাবে ফুটে উঠে যা সাধারণত অন্য কোন গানে দেখা যায় না।

চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া

কোথাও চটকা বা কোথাও চটুল ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত। এমন কি কোথাও কোথাও জমানো ভাওয়াইয়া গানও বলা হয়ে থাকে। এ গান মূলত দ্রুত লয়ের হয় চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া দুই প্রকার।

ক) চটকা সুর প্রধান।
খ) চটকা কথা প্রধান।

কথা প্রধান চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া: অন্যান্য ভাওয়াইয়ার মতো টান থাকে না। এ গানে আলাদা সুর লক্ষ্য করা যায়। যে সুর অন্যান্য সুরের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম · এ সুরের মাঝে তাল লয়, সব মিলে হয়ে উঠে মিষ্টি এক অনুভূতি।

কথা প্রধান চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া: সুর প্রধান চটকা ভাওয়াইয়ায় যেমন সুরকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কথা প্রধান চটকা ভাওয়াইয়ায় সুরকে প্রাধান্য না দিয়ে কথাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অর্থাৎ কথাকেই সাজিয়ে গান করা হয়।

ক্ষিরল ভাওয়াইয়া

দীঘলনাশী ও চটুল ভাওয়াইয়া মতো না। গানগুলো মাঝারী লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। ৭ ভাওয়াইয়ায় অন্যান্য ভাওয়াইয়ার সুর খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষিরল ভাওয়াইয়ায় এক ধরনের মিষ্টি সুর লক্ষ করা যায়। অনেক ভাওয়াইয়া বিশেষজ্ঞ অনেকভাবেই এ গান বিশ্লেষণ করেছেন। জনাব সিরাজউদ্দীন (প্রাক্তন উপ-মুখ্য প্রযোজক, বাংলাদেশ

বেতার, রংপুর) বলেছেন উত্তরাঞ্চলের পায়েসকে বলা হয় ক্ষির যা খেতে খুবই মিষ্টি ও সুস্বাদু। ঠিক তেমনি গানের জগতে ক্ষিরল ভাওয়াইয়াও অত্যন্ত মিষ্টি গান। অনেকটা ক্ষিরের মতো, সেই জন্য ক্ষির এর নামকরণ ক্ষিলর হয়েছে। ক্ষিরল ভাওয়াইয়া দুই প্রকার।

(ক) কাটা ক্ষিরল।

(খ) উল্টা ক্ষিরল।

(ক) কাটা ক্ষিরল ভাওয়াইয়া : কাটা ক্ষিরল একটু থেমে গাওয়া হয়ে থাকে। এ ভাওয়াইয়ার বাজনার মধ্যে আলাদা ধরনের কারুকার্য দেখা যায়। অনেক সময় এ গানে সাধারণ মৃদঙ্গ (খোল) মন্দিরা, সারিন্দা ও এক তারের ব্যানা থাকে।

(খ) উল্টা ক্ষিরল ভাওয়াইয়া : কাটা ক্ষিরলের মতো হলেও এ ভাওয়াইয়ায়, ভাওয়াইয়া গানের প্রধান সহযোগী যন্ত্র দোতরা বিশেষভাবে বাজানো হয়।

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া বলতে যে ভাওয়াইয়ায় পল্লীবালার বিচ্ছেদের করুণ চিত্র ফুটে উঠে তাহাই বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া। এ গানে পুরুষের বিচ্ছেদের কথাও থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে, বিচ্ছেদী ভাওয়াইয়া বলতে নারী মনের উপচে পড়া ভালোবাসা, হৃদয়ের না বলা কথা, বিরহের অসহনীয় যন্ত্রণাই এ গানে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া তিন প্রকার

(ক) সাধারণ বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া।

(খ) কাল্পনিক বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া।

(গ) আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া।

সাধারণ বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া: সাধারণ বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া বলতে যে ভাওয়াইয়ায় একজনের দুঃখ কষ্ট ও বিরহের কথা প্রকাশ পায় তাহাই সাধারণ বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া।

কাল্পনিক বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া: কল্পনার মধ্যে যে গান ফুটে উঠে অর্থাৎ পশু, পাখি, সহ অন্যান্য কিছুর মধ্যে কল্পনা করে যে গান ভাওয়াইয়া করা হয়ে থাকে তাহাই কাল্পনিক বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া।

আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া: খোদা, ভগবান, রাসুল, পীর, পয়গম্বর, দেব, দেবতা, গুরু সহ ইত্যাদির উপর যে ভাওয়াইয়া করা হয় তাহাই আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া।

মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া

মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া একটি নির্দিষ্ট পরিসরের ভাওয়াইয়া। বাংলার মহিষের রাখালকে বলা হয় মৈষাল আর এই মৈষালকে ঘিরে যে ভাওয়াইয়া রচিত হয় তাহাই মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া। জানা গেছে মহিষের বাথান নিয়ে মৈষাল

যখন মাঠে, প্রান্তরে ঘরে বেড়াত, সকালে বেড়িয়ে যেতো আর ফিরতো সেই সূর্য অস্ত যাবার পর। ঘাড়ে থাকতো দোতারা। এক ঘেয়েমী কাটানোর জন্য মৈষাল নিজেই গান রচনা করে তাল, লয় ছাড়া দোতরা বাজিয়ে একাকী প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে গান করতো। আবাব মৈষাল বন্ধুর জন্য অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে পল্লীবালা তার মৈষাল বন্ধুর জন্য যে ভাওয়াইয়া গাইতো তাহাই মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া। মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া দুই প্রকার।

(ক) আবেগ প্রবণ মৈষালী দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া।

(খ) কল্পনা প্রবণ মৈষালী দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া।

আবেগ প্রবণ মৈষালী দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া: এ ভাওয়াইয়া উদাস উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া হয়ে থাকে। গানের তালের চেয়ে সুরকে প্রাধান্য দেয়া হয়। গায়ক আবেগ আপ্লুত হয়ে গান করে। সেটা বাস্তবের সাথে কোনো মিল খুজে পাওয়া যাক বা না যাক তা ভাবাবেগের উপর রচিত হয়ে থাকে।

কল্পনা প্রবণ মৈষালী দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া: মৈষাল তার কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে যে, ভাওয়াইয়া করা হয়ে থাকে, তাহাই কল্পনা প্রবণ মৈষালী বা দোয়ারিয়াল ভাওয়াইয়া। বেশ কিছু গানে কিন্তু লক্ষ করা যায় মৈষাল যে কল্পনা করে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করে তা বা্তবের সাথে কখনো মিল খুজে পাওয়া যায় না বা যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাও নেই। বাস্তবতার সাথে মিল না থাকলেও যুগ যুগ ধরে তা প্রচলিত হয়ে আসছে।

মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া এলাকায় এক সময় প্রচুর হাতি পালা হতো। যে হাতি পরিচালনা করে তাকে মাহুত বলা হতো। এই মাহুতরা যে ভাওয়াইয়া গান করতো সেই গানই মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া। অবশ্যই এ ধারা প্রায় বিলুপ্ত। দু'একটি গান ছাড়া এ গান খুব একটা দেখা যায় না। বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, জনাব আজাহাব আলী বলেছেন, হাতিকে ধরা বা পোষ মানার জন্য রাত জেগে শীতের মধ্যে আগুন পোয়াতে হতো মাহুতদের, একাকী কাটতো না তাদের কোনও সময়, তারা তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে সুরারোপ করে যে গান করতো সেই গানই মাহুত বন্ধুর গান। মাহুত বন্ধুর গান ভারতের আসাম এলাকায় এক সময় বহুল প্রচলিত ছিল এখন তা প্রায় বিলুপ্ত।

ভাওয়াইয়া গান ও রাগরাগিনী

বৌদ্ধ গান ও দোহা (হর প্রসাদ শাস্ত্রী সম্প্রাদিত) বাংলা ভাষায় রচিত সর্ব প্রাচীন রাগ রাগিনী সংবলিত পুঁথি। এ গ্রন্থটি খ্রিস্টিয় ১২তম শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত হয়েছিল। এতে বাংগাল রাগ নামে একটি রাগের উল্লেখ আছে। তার রচয়িতা ছিলেন "ভুসুক" আর এই ভুসুক ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের অধিবাসী এবং বংগাল রাগই ভাওয়াইয়া নামে অনুমেয়, আবার অনেকে তা বিশ্বাস করেন না। যদি বংগাল রাগ ভাওয়াইয়া হয়ে থাকে তাহলে ভাওয়াইয়ার জন্ম ১২শ শতাব্দীর পূর্বে। আবার আমরা যদি একটু গভীরে চিন্তা করি তাহলে দেখবো ১২শ শতাব্দীতে হয়তো রাগটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐ সময়

ভাওয়াইয়ার জন্ম তা বিশ্বাস যোগ্য নয়। কেননা আমরা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার আলোচনায় দেখবো ভাওয়াইয়া তারও অনেক আগে উৎপত্তি হয়েছে।

অনেকে মনে করেন বা ধারণা করেন যারা ভাওয়াইয়া গান করেন, তারা কোনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা রাগ রাগিনীতে বিশ্বাসী নন অথবা তাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দরকার হয় না বা তারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বোঝেন না। আসলে তা ঠিক নয়, ভাওয়াইয়া গানে বিভিন্ন রাগ রাগিনীর মূর্ছনা, তাল, পাকড়, মীড় ও গীটকরী যথেষ্ট প্রয়োজন।

ভাওয়াইয়া এলাকার বিভিন্ন জাতি ও ভাষা

ভাওয়াইয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে ভাওয়াইয়া অঞ্চলের আদি জাতি ও ভাষা নিয়েও আলোচনা করা দরকার। কেননা ভাওয়াইয়া গানে এমন কিছু ভাষা লক্ষ্য করা যায়, যে ভাষাগুলো বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন জাতির ভাষা থকে উদ্ভব হয়ে এ এলাকার ভাষায় পরিণত হয়েছে। শ্রী হেমন্ত কুমার বর্ম্মা "কোচবিহারে ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পাঞ্জাবের শৈবালিক পর্ব্বতে প্রস্তুরিভূত সামুদ্রিক প্রাণীর যে কঙ্কাল আবিস্কৃত হয়েছে তা দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে ভারতবর্ষ সহ আমাদের এই ভাওয়াইয়া এলাকা সমুদ্রগর্ভে শায়িতা ছিল। ক্রমশ সিন্ধু গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নদনদী সমূহ ও তাদের উপনদী যমুনা, শোণ, গণ্ডাক, করতোয়া, মহানন্দা, তিস্তা, ধরলা, তোর্ষা, শংকোচ, দুধকুমার, ফুলকুমার প্রভৃতি হিমালয় হতে প্রস্তর বালুকা ও কর্দমরাশি বহন করে এনে এই ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছে। নব সৃষ্ট এই উর্ব্বর ভারতভূমি যুগে যুগে মানব জাতির আদি জন্মভূমি, মধ্য এশিয়া হতে দলে দলে একের পর এক অন্য জাতিকে আকর্ষণ করে এনেছে।

অস্ট্রিক জাতি

এমনিভাবে ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্ত দিয়ে অস্ট্রিক বা অস্ট্রলয়েড জাতি সর্বপ্রথমে ভারতে প্রবেশ করে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তারা ছিল কৃষ্ণকায় জাতি। সাঁওতাল, কোল, ভিল, প্রভৃতি জাতি অস্ট্রিক জাতির বংশধর। তারাই কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তন করে। এরাই ভারতবর্ষের আদি জনগণ। এদের সবাই কালক্রমে অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং তাদের ভাষাও সর্বভারতীয় ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। কুড়ি গণ্ডা, গণ, গুঁড়ি, গুড়া, খাঁখাঁ, বাখারি, বাদুর, কানি (টুকরা), ঠেঙ্গ (পা), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁতলা, ছোপ্পা, কলি (চুন), ছোট, পেট, খাস, ঝাড়, ঝোড়, ঝোপ, ডোম, চোঙ্গ, চোঙ্গা, মেড়া (ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা, দাও, বাইগণ, পগার (জলের গর্ত), গড়, বরজ (পানের বরজ), লাউ, লেবু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর, পুণ্ড, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি, গঙ্গ, বঙ্গ, কপদাগ, (দাগজল), ঢেনকি, ঢেঁকি, মোটো, মোটা, ধান, জাম্বুরা, হলুদ, সুপারি, ডালিম, কর্পাস, কর্পট, কম্বল, বান, ধনু, পিনাক, কাক, কর্কট, কপোত, গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার, ডোঙ্গ, লিঙ্গ, প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। এ শব্দগুলোর কিছু শব্দ পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষাতেও প্রবেশ করেছে। সর্বভারতীয় জনগণের মধ্যে পাতলা কাল রঙ্গের জনগণের উপস্থিতি এবং সর্বভারতীয় ভাষার মধ্যে অষ্ট্রিক শব্দের উপস্থিতিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারত উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে অস্ট্রিক জাতির ও ভাষায় মিশ্রণ হয়েছে।

দ্রাবিড় জাতি

ভারতবর্ষে অস্ট্রিক জাতির আগমনের পর প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব পামির মালভূমির নিম্নদেশ হতে, ভারতের উত্তরপশ্চিম গিরিপথ দিয়ে দ্রাবিড় জাতি ভারতে অনুপ্রবেশ করে সিন্ধু উপত্যকায় সুপ্রাচীন কৃষিভিত্তিক সিন্ধু সভ্যতা বা দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে তোলে। মহেঞ্জোদেরো ও হরপ্পায় প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এরও পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় জনগণের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে। এদের ভাষাও সর্বভারতীয় ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। জোলা, গদ্দি, হাদা, কুণ্ড, কণ্ডি, ড়া (হাওড়া), গুড়ি (শিলিগুড়ি), জুলি জোল, ভিটা, কুণ্ড, উড়, পুর, কুট (নগর), কর্মার (কামার), রূপকলা (চারশিল্প), কপি, মর্কট, ময়ুর, ব্রীহি (চাউল), পূজা, পুষ্প, শিবন (শিব), শেম্বু (শম্বু), অন্ন, অরণি, কাল, কিতব, কুনার, গণ, নানা, নীল, পুস্কর, পূজন, ফল, বিল, বীজ, রাত্রি, অটবী, আড়ম্বর, খড়গ, তন্ডুল, মটকী, বলক্ষ, বল্লী, ঘোটক, প্রভৃতি, শব্দগুলো দ্রাবিড় শব্দ। এই দ্রাবিড় শব্দ গুলোর কিছু শব্দ সংস্কৃতেও প্রবেশ করেছে।

আর্য্য জাতি

দ্রাবিড় জাতির ভারতে আগমনের পর প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে মধ্য এশিয়ার ককেশাস পর্বতের সানুদেশ হতে আর্য্য জাতি ভারতের উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তারা যাযাবর জাতি ছিল এবং ঘোড়া পুষতো। দ্রাবিড় জাতির ঘোড়া ছিল না। আর্য্যগণ ঘোড়ার সাহায্যে যুদ্ধ করে দ্রাবিড়দিগকে পরাজিত করে ও বিতাড়িত করে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বিধৌত অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। দ্রাবিড় সভ্যতার তুলনায় আর্য্য সভ্যতা নিম্নমানের হলেও আর্য্যগণের বৈদিক ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন উন্নততর হওয়ায় ভারতীয় জনগণ আর্য্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাগ্রহ গ্রহণ করতে থাকে। আর্য্যগণ ছিল গৌরবর্ণ। তাদের মুখ বাদামী আকারের, নাসিকা উন্নত, চক্ষু বড় এবং দেহের গঠন লম্বা ধরনের। কালক্রমে এরাও ভারতীয় জনগণের মধ্যে মিশে যায়। সর্বভারতীয়দের মধ্যে লম্বা, গৌরকায়, বাদামী মুখের জনগণ আর্য্য রক্তের দান।

মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলয়েড জাতি

মঙ্গোলীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত চীনের সভ্যতা প্রায় দশ হাজার বছরের প্রাচীন। এই সভ্যতা মিশরীয় বা ইজিপ্সিয়ান সভ্যতার সমসাময়িক। সাহারা মরুভূমির বালুপাতের ফলে মিশরীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু চীনের মঙ্গোলীয় সভ্যতা নিজের প্রাচীন সত্ত্বা, অটুট রেখেছে। চীন দেশে প্রায় ছয় সাত হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন শহর ও প্রাচীন পুস্তক এখনও আছে। কাগজ, কালী, ছাপাখানা, সিল্ক, চিনামাটি মঙ্গোলীয় সভ্যতা তথা চীন সভ্যতার দান। বর্তমানে মঙ্গোলীয় সভ্যতার চীন, বিশেষত জাপান এশীয় জাতিদের মধ্যে উন্নততম জাতি। মঙ্গোলীয়গণ প্রধানত মঙ্গোলীয়, চীন, তিব্বত, ভারতের উত্তর পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল, জাপান,

কোবিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া সুমাত্রা, যাভা, বালি প্রভৃতি স্থানে বসবাস করে। এদের শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য হলো– দেহের গঠন মাঝারি ও মোটা ধরনের, গায়ের রং হলদে, মুখ গোলাকার চক্ষু ছোট ও চোখের উপরের পাতা ভারী, নাক ছোট ও চেপ্টা এবং মাথা গোলাকার।

আনুমানিক একশত খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মঙ্গোলীয় ইউচি জাতিভুক্ত কুষাণ বংশ ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। এদের হুন ও বলা হয়। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে শ্রেষ্ঠ কুষাণ রাজা কণিষ্ক খোটান, খোরাসান হতে আরম্ভ করে বিহার ও কোঙ্কন প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁর সামাজ্য বিস্তার করে। কাবুল পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতনা ও কাথিয়ার স্থান তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কালক্রমে কুষাণগণ ভারত উপমহাদেশের জনগণের সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের মধ্যে যাদের দৈহিক গঠন মোটা, মুখ গোল ও ভারী চোখ ও নাক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব আছে।

এরপর ভারতের উত্তর পশ্চিমের ঐ গিরিপথ দিয়েই গ্রিক, শক, হুন, পাঠান, মোগল ভারতে প্রবেশ করে রাজ্য স্থাপন করে। কালক্রমে ভারতীয় জন সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। এরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য্য, মঙ্গোলীয় ও কিয়ৎ পরিমাণ নিগ্রয়েট জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় ভারতীয় জাতি সমূহ ও ভারতীয় সভ্যতা। (ড. নীহার রঞ্জন রায় রচিত "বাঙ্গালীর ইতিহাস" ও ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" পুস্তক দ্রষ্টব্য)

আদিবাসী :

ভাওয়াইয়া এলাকার আদিবাসী সম্পর্কে মিঃ রিসলি তার "Trines and Casts of Bengal" পুস্তকে লিখেছেন যে, কোচ, কোচমণ্ড, রাজবংশী, পলিয়া, দেশি প্রভৃতি জাতি যারা উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ববঙ্গে বাস করে, তাঁরা দ্রাবিড় জাতি সম্ভবত এবং এদের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান রক্তের মিশ্রণ আছে বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। (Cooch Behar Satate an Land Revenue Settlement-by Harendra Nath Chaudhury পুস্তক দ্রষ্টব্য) কেহ কেহ রাজবংশী জাতি মঙ্গোলিয়ান জাতি হতে উদ্ভুত বলে মনে করেন। কিন্তু কেহই কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। কোনও প্রাচীন ইতিহাসে বা প্রস্তরলিপিতে বা তাম্রলিপিতে রাজবংশী জাতির কোনও ইতিবৃত্ত দৃষ্ট হয় না। ড. নীহাররঞ্জন রায় তার রচিত, বাঙ্গালীর ইতিহাস" পুস্তক (৫৪ পৃষ্ঠা আদিপর্ব্ব) লিখেছেন "খ্রিস্টীয় দশম শতকে কম্বোজামা আর এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। দিনাজপুর জেলা বাণগড়ে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে এদের "কম্বোজাম্বয়জ গৌড়পতি" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইর্‌দা তাম্রপত্রেও এদের উল্লেখ দেখা যায়। এই "কম্বোজাম্বয়জ রাজারা কারা? কোথা হতে তারা এসেছিল দেবপালের মুঙ্গের শাসনে এই কম্বোজের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই কম্বোজ দেশ যে উত্তর পশ্চিমের গান্ধার দেশের সংলগ্ন দেশ এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বহু দিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় বলেছিলেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তা সমর্থন করেছিলেন যে, এই কম্বোজরা তিব্বত ভোটান প্রভৃতি হিমালয়ের সানু দেশের কোনও মঙ্গোলীয়জনের

শাখা এবং বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কোচ, পলিয়া, রাজবংশীদের পূর্বপুরুষ। সুনীতিবাবু কম্বোজের সঙ্গে কোচ শব্দের একটা শব্দতান্ত্রিক যোগও করেছিলেন। অনেকের মতে পূর্ব সীমান্তে গান্ধার সংলগ্ন একটা কম্বোজ দেশ ছিল। বাংলার কম্বোজ রাজবংশ সেই দেশ হতে আগত। যদি তা হয়, তাহলে এরা মঙ্গোলিয়ন পরিবারভুক্ত তা অনুমান সঠিক।

রাজবংশী শব্দটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এই জাতি আর্য্য এবং সংস্কৃতভাষী। রাজবংশী শব্দের অর্থ রাজার বংশ। প্রাচীন ভারতের রাজাগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং রাজবংশ হতে উদ্ভুত বলে রাজবংশী জাতি ক্ষত্রিয়, ইহা প্রমাণিত হয়। উত্তরবঙ্গে একটি মাত্র আর্য্যজাতি রাজত্ব করে ছিলেন। তারা বলেন "কম্বোজায়জ গৌড়পতি যাদের কথা দিনাজপুর বানগড় প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ আছে। সুতরাং এই কম্বোজ রাজবংশ হতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী উদ্ভব হয়েছে- তা অতি সঙ্গত সিদ্ধান্ত। আবার এও দেখা যায় যে, উত্তরবঙ্গের তথা ভাওয়াইয়া এলাকায় নদীগুলোর নাম সমস্তই সংস্কৃত বা সংস্কৃত হতে উদ্ভুত, যথা-মহানন্দা, করতোয়া, তিস্তা, (তিস্রোতা), ধরলা, (ধবলা), গদাধর, নদীগুলোর নাম উল্লেখ আছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এই নদীগুলোর নাম সংস্কৃত হলো কিরূপে? এই অঞ্চলে যদি মঙ্গোলীয় জাতি বাস করতো তাহলে এই নদীগুলোর নাম সংস্কৃতি না হয়ে মঙ্গোলীয় শব্দজাত কোন নাম হতো। সুতরাং নদীগুলোর সংস্কৃত নাম হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এই উত্তরবঙ্গে সংস্কৃতভাষী জনগণ বাস করতো এবং তারাই এই অঞ্চলের নদীগুলোর সংস্কৃত নাম দিয়েছেন। অনেকে একমত হয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী প্রধানত রাজবংশী জাতি। এই সংস্কৃত নামগুলো তাদের দেয়া। এই দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজবংশী জাতি সংস্কৃতভাষী ও আর্য্য। অবশ্য পরবর্তী কালে কোচবিহার রাজবংশে সঙ্গে এদের বিবাহদি হওয়ায় এবং ভোটিয়াগণ বহুবার এই রাজ্য আক্রমণ করায় রাজবংশী জাতির মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্ত মিশ্রণ হয়েছে, তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়াও ভাষাতত্ত্বের দিক হতে বিচার করলে দেখা যায় যে, উত্তরবঙ্গের তথা রাজবংশী ভাষার মধ্যে কিছু অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ আছে। সঙ্গত কারণেই বলতে হয় যে, উত্তরবঙ্গেও জনগণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে এবং ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহার হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গ তথা রাজবংশী জাতির ভাষা সংস্কৃত হতে উদ্ভুত। এ ভাষায় বহু মূল সংস্কৃত শব্দ আছে এবং প্রায় সমস্ত শব্দগুলো সংস্কৃতজাত।

উত্তরবঙ্গ তথা ভাওয়াইয়া এলাকার ভাষা	**সংস্কৃত মূল**	**অর্থ**
অয়ঁ, উয়াঁয়	অয়ম, অয়ঁ, উয়াঁয়	সে
অলপ	অল্প, অলপ্	অল্প, কম
অর্জিল	অর্জ+ইল = অর্জিল	অর্জন করলো
অকুমারী	নকুমারী	অল্পবয়স্কা
অফুলা	নফুল্ল	যা ফুটেনি
অত্তি	অত্তি, অটি	ওখানে
আইজ	অদ্য, আইজ	আজ

আবো	অম্ব, অব্ব, আবো	মায়ের মা
আজু	আর্য্যা, অর্জ্জ, আজু	মায়ের বাবা
আলসিয়া	আলস্য+ইয়া	আলস্য পরায়ন
অপুচা	পুছা, ন+পুচা + অপুচা	যাকে কেউ গণ্য করে না
আভং	অভঙ্গ, আভং	যা ভাঙ্গা হয়নি
গাথা	গ্রন্থ ধাতু, গাথা	গাঁথা
গাস	গ্রস ধাতু, গ্রস, গাস	গ্রাস
যায়	যায়, যদ শব্দ	যে
তাঁয়	তান (তদ্ শব্দ)	সে
সর্ব্বায়	সর্ব্বান (সর্ব্ব শব্দ)	সকলে
কাঁয়	কাঁয় (কিম শব্দ)	কে
এলায়	এ বেলা	এই সময়
সেলায়	সে বেলা	সেই সময়
গর্জ্জা (দেওয়া গজ্জিল)	গর্জ ধাতু	গর্জন করা
গোনা	গণ ধাতু, গণয়তি	গণনা করা
গগন	গগন	আকাশ
গাই	গাভি	গাই
গোসাঁই	গোস্বামী	বৈষ্ণব
গোঁসাই	গোস্বামিনী, গোঁসাইনী, গোসানী	বৈষ্ণবী
গরু	গো শব্দজাত	গরু
গোয়াইল	গোপকুল, গোয়াইল	গোয়াল ঘর
মুঁই	অহম, হম্, মুই	আমি
তুঁই	ত্বম, তোম, তুম	তুমি
বাউরা	ব্যাকুল, বিয়াকুল, বাউল, বাউরা	পাগলা
চিন	চিহ্ন, চিন্	চিহ্ন
ভিন	ভিন্ন, ভিন্	ভিন্ন
খাড়া	খড়গ, খাড়া	খাড়া
চুমা	চুম্ব ধাতু, চুম্বতি	চুমা
ভাতার	ভর্ত্তৃ, ভাতার	ভাতার
ইস্তিরী	স্ত্রী, ইস্তিরী	স্ত্রী
পরবাস	প্রবাশ, পরবাস	প্রবাস
বৈশাখ	বৈশাখ	বৈশাখ
জেঠ্	জ্যৈষ্ঠা, জেঠ্ঠ, জেঠ্	জ্যৈষ্ঠ্য মাস

আষাঢ়	আষাঢ়	আষাঢ়
শাওন,	শ্রাবণ, শাওন	শ্রাবণ
ভাদোর	ভাদ্র, ভাদ্দর, ভাদোর	ভাদ্র
আশিন	আশ্বিন, আশিন	আশ্বিন
কাতি	কার্তিক, কাতি	কার্তিক
আগোন	অগ্রহায়ণ, আগোন	অগ্রহায়ণ
পুষ	পৌষ, পুষ	পৌষ
মাঘ	মাঘ	মাঘ
ফাগুন,	ফাল্গুন, ফাগুন	ফাল্গুন
চৈত্	চৈত্র, চৈত	চৈত্র
বাবা, বাও	বপ্তা, বপ্পা, বাও	বাবা
বাহে	বা+ হে = বাহে	পিতৃস্থানীয় লোকদের
মাও, মাই, মাইও	মাত্র, মায়ী, মাই, মহিও	মা
শ্বশুর	শ্বশ্র শ্বশুর	শ্বশুর
শালা	শ্যালক, শালা	শালা
শালপইত্	শালীপতি, শালপইত	শালীর স্বামী
বাপই	বপ্তা, বাপ্পা, বাপ+ই= বাপই	পুত্র স্থানীয় লোকদের সম্বোধন
জেঠ পইত্	জ্যেঠ শালীপতি জ্যেঠপইত	জ্যেষ্ঠ শালীর স্বামী
জিও	জীব, ধাতু, জীবিত, জীব	জীবন ধারণ করা
তরায়	ত্রাণ ধাতু, তরায়	ত্রাণ করা
তারাৎ (তারাৎ করি)	তড়িৎ তাড়াৎ	বিদ্যুৎ (গতিতে)
ভাতিজা	ভ্রাতৃজাত, ভাতিজা	ভাইয়ের ছেলে
ভাতিঝি	ভ্রাতৃ+ঝি= ভাতিঝি	ভাইয়ের মেয়ে
তাওয়াই	তাত+আই= তাওয়াই	তাওয়াই
মাওয়াই	মাতৃ, মাও+আই- মাওয়াই	মাওয়াই
মাইয়া	মহিলা (স্ত্রী অর্থে)	মেয়ে মানুষ
সোয়ামী	স্বামী, সোয়ামী	স্বামী
দুয়োর	দ্বার, দুয়োর	দ্বার
ভুয়া	ভুয়া	ভুল
মিছা	মিথ্যা, মিচ্ছা, মিছা	মিথ্যা
মোর	মম, মো+র = মোর	আমার
সচা	সত্য, সচ্চ, সাচা,	সত্য
শিথান	শিরস্থান, শিথান	মাথা রাখিবার স্থান
পইথান	পদস্থান, পইথান	পা রাখিবার স্থান
হাত	হস্ত, হস্ত, হাত	হাত

পাও	পদ পাও পা	পা
মাথা	মস্তক, মাথা	মাথা
গালা	গলা, গালা	গলা
আঙ্গুল	অঙ্গুলি, আঙ্গুল	আঙ্গুল
কেশ	কেশ	চুল
নাক	নাসিকা	নাক
বান	বন্যা, বানা	বান
চউক	চক্ষু, চউক	চোখ
সাউধ	সাধু, সাউধ, সাউদ	ব্যবসায়ী
বানিয়া	বণিক, বাণিয়া	অলঙ্কার প্রস্তুতকারক
তপত (তপত জল)	তপ্ত, তপত	গরম
তরাও	তৃ ধাতু, তরতি	ত্রাণ কর
দাহ	দহ ধাতু, দহতি	পোড়ান
নিন্দা	নিন্দ ধাতু, নিন্দতি	নিন্দা
নউক	নখ, নউখ	নখ
শিং	শৃঙ্গ, শিং	শিং
কাম্	কর্ম্ম, কাম	কাজ
চাম্	চর্ম্ম, চাম্	চাম
নেঙ্গুর (গরুর নেঙ্গুল)	লাঙ্গুল, নাঙ্গুল	লেজ
দেও	দেব, দেও	দেবতা
বাও	বাতাস, বাও	বাতাস
দেওয়া	দেবতা, দেওয়া	আকাশ, মেঘ
মাশান	শ্মশান, মশান, মাশান	শ্মশান
বুড়া,	বৃদ্ধ, বুড্ডা, বুড়া	বুড়া
বুড়া, ঠাকুর	বৃদ্ধ ঠাকুর	শিবঠাকুর
বুড়ী ঠাকুর	বুড়া+ঈ=বুড়ী ঠাকুর	পার্ব্বতী
বিষহরা	বিষহারিণী বিষহরা	পদ্মাবতী ঠাকুর
ঘর	গৃহ, গেহ, ঘর	ঘর
গাইরস্থ	গৃহস্থ, গাইরছ	গৃহস্থ
জাড়	জাড্য, জাড়	শীত
পাছোৎ	পশ্চাৎ, পাছোৎ	পশ্চাতে
পাছুয়া (পাছুয়া স্ত্রী)	পশ্চাৎ পাছুয়া	পরে গ্রহণ করা স্ত্রী
পিয়াস তিয়াস	পিপাসা পিয়াস	পিপাসা
ভোখ	ভুক্ষা, ভোখ	ক্ষুধা
হয়	ভরতি, ভয়ি, ভয় (ভু ধাতু)	হওয়া

আম	অম্র, আম	আম
যম্ভুরা	যম্ভির, যম্ভরা	যম্ভুরা ফল
ভ্যাকরা (ভেকরা লাঠি)	বক্র, বেকরা, ভেকরা	বক্র
ধান	ধান্য, ধান	ধান
সইরষা	সর্ষপ, সরিসা সইরসা	সইরসা
কুড়াল	কুঠার, কুড়াল	কুড়াল
মানসি	মনুষ্য, মানুষ , মানসি	লোক
গোন্দায়	গন্ধ, গোন্দ+আয়= গোন্দায়	গন্ধ করে
ডাণ্ডা	দন্ড, ডাণ্ডা	লাঠি
পুঁজ (পোয়ালের পুঁজ)	পুঞ্জ, পুজ	স্তুপ
দর্পন	দর্পণ	আয়না
বস, অস	রস	রস
বন্ন	বর্ণ, বন্ন	বর্ণ
বাত, বাও	বাতঃ	বাতাস
পাঠ	পঠ, ধাতু, পঠতি (to read)	পড়া
ফলে	ফল ধাতু (to result), ফলতি	ফল হয়
রাখ	রক্ষ ধাতু (to keep) রক্ষতি ভাদি, বমতি	রাখা
বমি	বম ধাতু (to vomit) ভাদি, বমতি	বমি
বাস	বস ধাতু (to dwel) ভাদি, বসতি	বাস করা
বর্ষে	বৃ ধাতু, ভাদি, বর্ষতি	বর্ষণ করা
খলটা (কথা খলটে যায়)	জ্বল ধাতু (to fald down) জ্বলতি	জ্বলতি হওয়া
সনসনায়	স্বন ধাতু (to sound) স্বনতি	শব্দ করা
পালায়	পরা+অয়তে=পলায়েত	পলায়ন করা
তরাও	ত্রৈ ধাতু (to peotect) ত্রায়তে	ত্রাণ করা
বন্দোং	বন্দ ধাতু (to salute) বন্দতে	বন্দনা করি
বত্তি (বত্তি যাঁও)	বৃত ধাতু (to exist) ভাঃ	বাঁচিয়া যায়
সয়	সহ ধাতু (to bear, to suffer)	সহ্য করা
ধরোং	ধৃ ধাতু (to hold) ধরোমি, ধরোং	ধরি

নেঁও	নী ধাতু (to carry) ভাঃ নয়ামি নেও	লই
বোধ	বধু ধাতু (to know)	বুদ্ধি
ভজ	ভজ ধাতু (to serve) ভর্জতি	ভজনা করা
বয় (ধান বয়)	বপ ধাতু (to sow) ভাঃ বয়তি, বয়	বপন করা
পোছ	পৃচ্ছ ধাতু (to ask) তুদাদাদি, পৃচ্ছতি	জিজ্ঞাসা করা
মজনু	মসজ ধাতু (to sink) মজ্জতি	মজিলাম
ভাজা, ভাজি	ভ্রসজ ধাতু, তুদাদি (to fry) ভূর্জ্জতি	ভাজা করা
দেখা, দেখোঁ,	দৃশ ধাতু (to see) দ্রক্ষামি দেখোঁ	দেখি
মরমো	মৃ ধাতু (to die) তুদাদি, মরিষ্যামি, মরমো	মরিব
মোছা (ঘর মোছা)	মৃঞ্চ ধাতু (to set free) তুদাদি মঞ্চতে	লেপা
সেচ (জল সেচা)	সিচ ধাতু (to water) সিঞ্চতে	সেচন করা
নাচা	নৃৎ ধাতু (to dance) দিবাদি নৃত্যাতি	নাচা
শাম্য	শম ধাতু (to grow calm) দিবাদি শম্যতে	শান্ত হওয়া
তৃপ্তি	তৃপ ধাতু + ক্তি (to be satisfied) তুষ্যতি	শান্ত হওয়া
দমেক দমধর	ধম ধাতু (to check) দিবাদি, দম্যতে	দমন করা
ভ্রষ্টা, ভ্রষ্টা	ভ্রনশ ধাতু (to fall down) ভ্রশ্যতি	নষ্ট হওয়া
সখায়	শুষ ধাতু (to be dried) শুষ্যতি	শুষ্ক হওয়া
যুজ্জ করা	যুব ধাতু (to fight) দিবাদি যুধ্যতি	যুদ্ধ করা
বরিয়া নেওয়া	বৃ ধাতু (to chose) স্বাদি বৃনোতি	বরণ
করোং করমো	কৃ ধাতু তনাদি (to do) করোং করোমি	করি

কেনোং কেনমে	ক্রী ধাতু (to buy) ক্র্যাদি ক্রীনামী	কিনিব
জানোং, জানমো	জ্ঞা ধাতু (to know) ক্র্যাদি জানামি জানেদ জানম	জানি
গাথোঁ, গাথমো	গ্রন্থ ধাতু (to make) গ্রন্থমি, গাথো, গ্রন্থামঃ	গাঁথি
বাঁধমো বাঁধো	বন্ধ ধাতু (to bind) ক্র্যাদি ধধ্নামি বাঁধো	বান্ধি
যাও, যামো	যা ধাতু (to go) অদাদিযাঁও, যামঃ	যাই, যাব
দোয়া (দুধ দোয়া)	দুই ধাতু, আদাদি দুগ্ধি	দোহন করা
অর্চ্চনা করা	অর্চ ধাতু (to worship) চুরাদি অর্চ্চয়তি	পূজা করা
গর্জিল, গজ্জে	গর্জ ধাতু, চুরাদি, গর্জয়তি গর্জে	গর্জন করা
ঘটে ঘটিল	ঘট ধাতু (to sound) চুরাদি ঘটয়তি	ঘটে
চিন্তা, চিন্তিয়া	চিন্ত ধাতু (to think) চুরাদি চিন্ত য়তি	চিন্তা করা
তাড়াও, তাড়েদে	তড় ধাতু, (to beat) চুরাদি, তাড়য়তি	তাড়ান
পালছোঁ, পালো	পাল ধাতু (to protect) চুরাদি পালয়মি পলোং	পালন করা
তক্ক করা	তর্ক ধাতু (to argue) চুরাদি, তর্কয়তি	তর্ক করা
পোজং, পোজমো	পুজ ধাতু (to worship) জুরাদি পুজয়ামি	পূজা করিব
মানোং, মানমো	মান ধাতু (to honour) চুরাদি মানয়ামি মানয়াম	মানিয়া লওয়া
কেথা, কাঁথা	কন্থা, কাথা, কেথা	কথা
জিবা	জিহ্বা, জিব	জিব
দশা	দশা	অবস্থা
নিন্দ	নিন্দ্রা, নিন্দ	নিদ্রা
পাঁও	পদ, পাও	পা
ময়য়া ময়	মায়া	মায়া
মাটি	মৃত্তিকা, মট্রিয়া, মাটি	মাটি

ছাতা'	ছত্র, ছত্ত, ছাতা	ছাতি
উব্‌জিল (ছাওয়া উব্‌জিল)	উপ জন ধাতু+ইল উপজিল	বাচ্চা জন্মিল

দেশজ শব্দগুলো নিম্নরূপ:

এটা ওটা, উদলা, কাকা, কাকি, মামা, মামি, দাদা, দাদি, দিদি, লাঙ্গল, জোঙ্গাল, পেন্টি, দড়ি, কুলা, টাকা, পয়সা, খুটি, চাল, কোচা, ডাকই, ভাউসানী, ভাশুর ইত্যাদি।

বিদেশী শব্দ:

পেয়াদা, আফিস, কাছাড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত, রেল, স্টেশন, রেলগাড়ি, রেল লাইন, টেবিল, চেয়ার, জজ, হাকিম, মেজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডাক্তার, কনেস্টবল, চা, পিঁপে, আতা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি।

অস্ট্রিক শব্দ:

কুড়ি, গণ্ডা, পণ, গুড়ি, গুড়া, খাঁ, খাঁ, বাখারি, বাদুর, কানি, ঠেঙ্গ, ঠোঁট, পাগল, ছাচ, ছোঞ্চা, মেড়া, বোয়াল, করাত, দা, দাও, বাইগণ, পগার, গড়, বরজ, লেবু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর, গঙ্গা বঙ্গ, মোটা, ঢেকি, জাম্বুরা, হলুদ, সুপারি, ডালিম, কম্বল, বান, ধনু, কাক প্রভৃতি।

দ্রাবিড় শব্দ:

জোলা, গদ্দি, কুণ্ড, জুলি, জোল, ভিটা, পুর কর্মার (কামার), রূপ, পূজা, শিবন (শিব), শেম্ভু (শম্ভু), নানা, নীল, ফল, বিল, খড়গ প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গ তথা রাজবংশী জাতির ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সংস্কৃতি ক্রিয়াপদ নিম্নরূপ

উত্তরবঙ্গ তথা রাজবংশী জাতির ভাষায় ক্রিয়াপদ	সংস্কৃতি ক্রিয়াপদ
মুঁই ভাত খাঁও	অহম ভত্তম খাদামি
আমার ভাত খামো	বয়ম ভত্তম খাদাম
তুঁই ভাত খা	ত্বম ভত্তম খাদ
মুঁই ভাত না খাঁও	অহম, ভত্তম না খাদামঃ
আমরা ভাত না খামো	বয়ম, ভত্তম ন খাদামঃ
তুঁই ভাত না খাইস	ত্বম, ভত্তম ন খাদাসি
মুঁই কাম করোং	অহম কর্ম্ম করোমি
আমরা কাম করমো	বয়ম কর্ম্ম কুর্ম্মঃ
তুঁই কাম করিস	ত্ব কর্ম্ম করোসি
আমরা কাম ন করমো	বয়ম কর্ম্ম না কুর্ম্মঃ

তুঁই কাম না করিস	ত্বম কর্ম্ম ন করোসি
মুঁই হরিণ দেখিম	অহম, হরিণম দ্রক্ষামি
আমরা হরিণ দেখমো	বয়ম্ হরিণম দ্রক্ষামিঃ
তুঁই হরিণ দেখিস	ত্বম হরিণম দ্রক্ষসি
মুই হরিণ না দেখিম	অহম, হরিণম ন দ্রক্ষামি
আমরা হরিণ না দেখমো	বয়ম্ হরিণম ন দ্রক্ষামঃ
মুঁই পুস্তক কেনোং	অহম পুস্তকম্ ক্রীনাসি
আমরা পুস্তক কেনমো	বয়ম্ পুস্তকম ক্রীনামঃ
তুঁই পুস্তক কিনিস	ত্বম পুস্তকম ক্রীনাসি
আমরা পুস্তক না কেনমো	বয়ম পুস্তকম ন ক্রীনাম
তুঁই পুস্তক না কিনিস	ত্বম পুস্তকম ন ক্রীনাসি
মুঁই হাত ধরোং	অহম হস্ত ধরাম
আমরা হাত ধরেমো	বয়ম হস্তং ধরাম
তুঁই হাত ধরিস	ত্বম হস্তং ধরিস
তুঁই কান্দিস	ত্বম ক্রন্দামি
আমরা কান্দোমো	বয়ম ক্রন্দাম
তুঁই কান্দিস	ত্বম ক্রন্দসি
মুঁই ভাত গেলোং	অহম ভক্তম গিরামি
আমরা ভাত গেলমো	বহম ভক্তম গিরামি
তুই ভাত গিলিস	ত্ব ভক্তম গিরসি
মুঁই আম গোনোং	অহম আম্রম গণয়ামি

আমাদের ভাওয়াইয়া এলাকার ভাষায় তথা রাজবংশী জাতীয় মধ্যে অনেক প্রবাদ আছে এলাকায় তাকে সিলকা বা সিল্লক বলা হয়। বহু প্রাচীনকাল হতে বংশ পরম্পরায় এই প্রবাদ বাক্যগুলো বিভিন্নভাবে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়েছে। নিম্নে কিছু প্রবচন উল্লেখ করা হলো।

১. বিধাতার কলম খণ্ডান না যায়,
ভাঙ্গা গড়া দুটি কর্ম্ম বিধাতা করায়

২. কলি কাল, মন্দ কাল, কলির সাত ভাও
যোঁয়ান বেটা না পোষে বৃদ্ধ বাপ মাও

৩. গুর সাচা পিণ্ডি কাচা সংসারে কয়,
গুরু না ভজিলে দেহ শিয়ালে না খায় (সাচা-সত্য, পিণ্ডি- দেহ পিণ্ড)

৪. আসপরসী কান্দে তোর যদি থাকে গুণ
ককিধমিন্ন মাও কান্দে যাবদ বাঁচে প্রাণ
(কুকি ধম্মি– যে কোলে করে মানুষ করে)

৫. হাট করে হাটুয়া যেমন, হাটের পরিচয়

হাট ভাঙ্গিয়া গেইলে, কারো কেউ নয়।
৬. দুধ মিঠা, চিনি মিঠা, আারো মিঠা ননী
তার চাইতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী
৭. মাছে চিনে গহীন জল, পক্ষী চিনে ডাল
মায়ে চিনে পুতের দয়া, যার বক্ষে শাল
৮. সীতা মইলে সীতা পাবো প্রতি ঘরে ঘরে
গুণের ভাই, লক্ষণ ছাড়ি গেইলে ভাই কবো কারে
৯. ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিষয় পায়
টেরিয়া করি পাগড়ি বান্ধে ছ্যাঁয়ার ভিতি যায় (ছ্যাঁয়া -ছায়া)
বাঁশের পাতারির নাকান ক্যার ক্যারে বেড়ায় (পাতারি-পাতা)
১০. এক থোপের বাঁশ নছিবের লেখা
কাইও হয় ফুলের সাজি কঁইও হাড়ির ঝাটা (কাঁই- কেউ)
১১. রাজা হয়া না করে রাজ্যের বিচার
পুত্র হয় না করে পিতারে উদ্ধার
নারী হয়া না করে যায় স্বামীরে ভকতি
শিষ্যা হয়া না করে গুরুর আরতি
এই কয়জন মইল্লে, রাণী যাইবে অধোগতি (মইলে -মারা গেলে)
১২. অধিক ঢাঙ্গা না হই বাতাসে হেলায়
অধিক খাটো না হই বেঙে ন্যাদায় (ন্যাদায়-লাথি দেয়)
১৩. অধিক ধনী হয়া না হই চিতর (চিতর-চিত হয়ে শোয়.)
অধিক কাঙ্গাল হয়া, না হই কাতার
১৪. আগিয়ানে কইল্লে পাপ, গিয়ান হইলে সারে (আগিয়ান- অজ্ঞান)
গিয়ানে করিলে পাপ, সাঙ্গে নাহি নরে (গিয়ানে– জ্ঞানে, সাঙ্গে- ভারে)
১৫. আশা সে পরম দুঃখ
নিরাশা পরম সুখ
১৬. আগধায় বান্ধে আলি,
তাঁয় খায় শৌল বোয়ালী
১৭. আঙ্গিনা নষ্ট করে ছিম ছিম পানি,
ঘর নষ্ট করে কান ভাজানী (কান ভাজানী-কান কথা)
১৮. আগত হাটে পষাদ বাটে
তিন চন্দ্রে, তাক না আটে (না কাটে-কুলায় না)
১৯. উপরা মানষিক যাগা দিলে উড়ন গাইনের খয়, (উপরা মানষি-অযাচিত লোক)
যাবার বেলা একনা কতা, অধিক করি কয়। (একন্যা কতা–একটা কথা)
২০. উবকারী গাছের, নাই ছাল (উপকারী গাছ-উপকারী গাছ)
উবকারী মাইনষের, নাই ভাল (ভাল্-ভাল)
২১. একে পাতে খাই,
তোর ক্যানে গাও দুমদুম মোর ক্যান নাই। (ক্যানে- কেন, গাও- গা)

২২. কুপুত্রক ধন দেই না
সুপুত্রক ধন নাগেনা (নাগেনা-লাগে না)
২৩. কুলা যে গরবো করে ঝাড়ি পাছড়ি তোলে (গরবো-গর্ব)
চাল্লি যে গরবো করে দেড় তেড়েয়া পড়ে (চাল্লি-চালুনি)
২৪. খায় দায় পঙ্খী, বনের ভিতি আঙ্খী।
২৫. ছাওয়ার হাতত পৈলা ডিমা
নাড়তে নাড়তে নিকলাইল কুসুমা (কুমা-ডিমের কুসুম)
২৬. জাতিয়ার আইটা খাই,
অন-জাতিয়ার নজিক না যাই (নজিক-কাছে)
২৭. তিষ্যা না জানে ঘাট অ-ঘাট
২৮. তুই বাছা সত্যত থাক,
আঁধার রাতিত মিলবে ভাত (রাতিত-রাতে)
২৯. তুই পাতবু খালত পাত
মোর আছে হাতোত তাক (তাক-মাপ)
৩০. ত্যালও দিবে কম, ভাজা খাবার যম।
৩১. তোমরাও কন উমরাও কয় কারবা কতা ধরিম,
দুই নৌকাত, পাও দিয়া কি মাঝ দরিয়াত মরিম (মরিম-মারা যাব)
৩২. দেখিলার বান্দি আনি,
আ- দেখিলার গীত্তানীক না আনি (গীত্তিনিক -গৃহিণীক)
৩৩. পর ভাতি হই (পরভাতি-পরের ভাত)
তঁও পর হাতি হই (পর হাতি–পরাধীন)
৩৪. ধাই ধাই করিয়া যাই, ঘাটে নাই নাও
খাই খাই করিয়া যাই, ঘরে নাই মাও
৩৫. পরের আশা করে যাই
নিত্য উপাস করে তাই
৩৬. পুরাণ ভিটা পোষে
নয়া ভিটা চোষে
৩৭. ফারি হউক, চিরা হউক গায়ের বস্তর
বড়া হউক, মোটা হউক মায়ের ছত্তর (ছত্তর-ছত্র)
৩৮. বার শষে গিরি, তের কামে তিরি (শষে-শষ্যে, গিরি-গৃহস্ত, তিরি-স্ত্রী)
৩৯. বাপ মায়ের আশুব্বাদ, খা বাচা ঘিউ ভাত (আশুব্বাদ- আশীর্বাদ, ঘিউ-ঘি)
৪০. বাপের থাকি বেটা সিয়ান, পুছি পুছি নেয় গিয়ান (সিয়ান-সজ্ঞান, গিয়ান-জ্ঞান)
৪১. ভাতে হীন বস্ত্রে হীন, তাক দেখি লাগে ঘীন (ঘীন-ঘৃণা)
৪২. মাউগ ভাতারে করে সুখ, তাঁয় দেখে কড়িকড়ায় মুখ
৪৩. মনে জানে পাপ, মায়ে চিনে বাপ (বাপ-পিতা)
৪৪. যাঁয় কয় আয়রে, তার সাতোত যায় রে
৪৫. যদি থাকে নসিবে, আপনে আসিবে (আসিবে-আসবে)

৪৬. যার কাছে সাধ, তাঁয় খায় পরসাদ (পরসাদ–প্রসাদ)

৪৭. যাঁয় না জানে রাউরা কাম
তায় ধরে হোতলাই খান

৪৮. যে হাড়িত না খামো ভাত
কাউয়া চিলায় হাগুক তাত (কাউয়া-কাক, চিলায়-চিল, হাগুক-পায়খানা)

৪৯. যদি থাকে মতোন থাকেনা ক্যা দেশের এক কোনোত

৫০. সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চড় খায়

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ভাওয়াইয়া গান মূলত ভাষা সৃষ্টি থেকে কোনও না কোনও ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা উপরোক্ত আলোচনায় দেখলাম মূলত রাজবংশী বা কামরূপী ভাষা থেকে ভাওয়াইয়ার প্রসার লাভ করেছে। আবার একথাও ঠিক যে, ভাওয়াইয়া গানে অস্টিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আর্য নরগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। দেশজ শব্দগুলো যেমনঃ এটা ওটা উদলা কাকা, কাকি, মামা, মামি, দাদা, দাদি, দিদি লাঙ্গল, জোঙ্গাল, পেন্টি, দড়ি, কুলা, টাকা, পয়সা, খুটি, চাল, কোচা, জাকই, ভাউসানী, ভাশুর ইত্যাদি। বিদেশী শব্দ যেমন; পেয়াদা, আফিস, কাছাড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত, রেল স্টেশন, রেলগাড়ি, রেল লাইন, চেয়ার, জজ হাকিম, মেজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডাক্তার, কনেস্টবল, চা, পেঁপে, আতা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। অস্টিক শব্দ যেমন; কুড়ি, গণ্ডা, পণ, গুড়ি, খাঁ খাঁ, বাখারি, বাদুর, কানি, ঠেঙ্গ, ঠোঁট, পাগল, ছাচ, ছোঞ্চা, মেড়া, বোয়াল, করাত, দা, দাও, বাইগণ, পাগার, গড়, বরজ, লেবু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর গঙ্গা, বঙ্গ, মোটাম ঢেঁকি, জাম্বুরা, হলুদ, সুপারি, ডালিম, কম্বল, বান, ধনু, কাক, প্রভৃতি। দ্রাবিড় শব্দ যেমনঃ জোলা, গদ্দি, কুণ্ড, জুলি, জোল, ভিটা, পুর-কর্মাব, (কামার), রূপ, ময়ূর, পূজা, শিবন (শিব), শেম্বু (শম্ভু), নানা, নীল, ফল, বিল, খড়্গ প্রভৃতি।

উপরোক্ত সকল ভাষা ভাওয়াইয়া-গানে বিদ্যমান। সকল ভাষা শব্দ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দেশী, বিদেশী, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, আর্য্য নরগোষ্ঠীর সময় থেকে ভাওয়াইয়া হয়তো ভিন্ন নামে গাওয়া হয়ে ছিল। যা আজ ভাওয়াইয়া রূপে ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বিভিন্ন প্রকার ভাওয়াইয়া উপর কিছু গান

দীঘলনাষী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া (১)
কথা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়ারে॥
যে দিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুইরা রয়রে
ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়ারে॥
আর কি কব দুঃস্কের জ্বালা গাড়িয়াল ভাই (দুঃস্কের-দুঃখের)
গাথিয়াছি বন মালারে
ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত কাঁন্দিম মুই নিধুয়া পাথারেরে॥
আর কি কব দুঃস্কের জ্বালা গাড়িয়াল ভাই
গাথিয়াছি বন মালারে
ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাকাও গাড়ি তুই চিলমারীর বন্দরে॥

পল্লীবালার মনের আকুতি, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা এ গানে প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রেমিক তথা গাড়িয়াল বন্ধু উপর যে ভালোবাসা। তা উদাস উদাত্ত কণ্ঠে এ গানে ফুটে উঠেছে। নারী মনের উপছে পড়া ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এই গানে স্থান পেয়েছে। নারীমন গুমরে গুমরে কাঁদে, থাকে না তার কোনও সাক্ষী। উল্লেখিত গানটি বাংলাদেশে সহ সারা পৃথিবীর সাথে চিলমারী বন্দরের পরিচয় করে দিয়েছে, গানটি হয়তো চিলমারীতে লেখা হয়েছে অথবা চিলমারীর কেউ লিখেছে।

দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া (২)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

ও মোর দয়ার ভাবীও ও মোর গুণের ভাবী
এই বার বিয়াও না দিলে মোক যাইম বাড়ি ছাড়ি॥ (মোক-আমাকে, যাইম-যাবো)

গরম ভাত খায় দাদা বউ আছে
মোর কপালোত ভাবী ঘুঘু নাচে
আলাপ না দিলে ভাবী দেইম এবার আড়ি॥
এই বার যদি মোক না দেয়া বিয়া
কথা কবার নং মই মাথা তুলিয়া
কাম কাজ ওরে ভাবী থাকিবেরে পড়ি॥
মনের ভথা ভাবী কও কার আগে
কি হইবে আর এ সংসারে
ঐ চিন্তা ভাবী যাইম যে মুই মরি॥

দেবর ও ভাবীর মধুর সম্পর্কের কথা এ গানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন: দেবরের বিয়ে কথা ভাবী ছাড়া আর কাউকে বলার বিশ্বাস রাখে না দেবর। (বড় ভাই) ভালো খাবার খায় আমোদ ফূর্তি করে, কারণ তার স্ত্রী আছে। দেবর এমন কথা ভাবীকে বলে, দুর্বল করে নিজে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। দেবর ঐ কথা ভাবীকে বলে মনের দুঃখ অনেকটা নিবারণ করে দেবর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবীকে জানায় এই মৌসুমে বিয়ে না দিলে সে কোনও কা করবে না এবং বাড়ি থেকে চলে যাবে। এমন হাজারো ঘটনা ঘটে এই গ্রাম বাংলায়। ঠি তেমন একটি গান।

দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া (৩)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

মনের মানুষ খুজিয়া পানু ভাবী
ধরলা নদীর পাড়ে
ওরে না কনু তাক মনের কথা ভাবী মনটা ধড়পড় করে॥
ওরে দারুণ জ্বালায় জ্বলছে ও তাই
বুঝনু মুখ ও দেখি
বুক ফাটে তার মুখ ফাটে না
ও তাই করে উঁকি ঝুকি
সউগ কথা তাক কবার মন ভাবী খুলিয়া মোর আগে (সউগ–সব)
মনের কথা যদি মনোত থাকে
জ্বালা বাড়ে বেশি
তুষের আগুনের মতো জ্বলে
কাঁই দিবে তাক নিভি (কাঁই- কে)
পাঁও ধরিয়া কঁও ভাবী তোক মিলন করো মোরে॥ (কঁও-বলা)

গ্রামের সহজ সরল দেবর, ভাবীর কাছ তার সকল আব্দার করে থাকে। তারই চিত্র খুঁজে পাও যায় এই ভাওয়াইয়ায়। কোনও এক সময় দেবর খুঁজে পায় তার কাঙ্খিত মনের মানুষকে লজ্জার কার

নিজে তাকে মনের কথা খুলে বলতে পারে না। দেবর যেমন: অন্তর জ্বালায় ছটফট করে, ঠিক তেমনি সেই পল্লীবালাও অনুরূপ যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। সেই পল্লীবালা কেন সব খুলে বলে না তার জন্য অনুনয় করে দেবর ভাবীকে। তুষের আগুনের মতো দু জনেই জ্বলে। এই ভাবী ছাড়া অন্য কাউকে সে এ কথা বলতে পারে না। তার দুঃখের কথা যেন খুলে বলে সে জন্য ভাবীকে মিনতি করে। তেমন একটি গান।

দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া (৪)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

কা কা করি কান্দিসরে কাউয়া (কাউয়া-কাক)
কলার ঢাউগনাত পরি (ঢাউগনা- কলার পাতার শক্ত শির)
বাপ মাও মোর কেমন আছে
না পাঁও ও মুই ভাবিয়ারে কাউয়া (না পাঁও-পারি না)
কলার ঢাউঙ্গনাত পরি॥
দুরান্তরে বাপের বাড়ি মোর
পাখি উড়ার চর
ভাই বোন মোর ছোট ছোট
কাঁই নেয় মোর খবর (কাঁই- কে)
গরু বেচার মতো মোক খাইছেরে তাই বেঁচি॥
ময়ালের পার ময়াল দেখং মুই
মন যায় মোর আউলিয়া
সোয়ামী মোর আলোরে ভোলা (সোয়ামী-স্বামী, আলারেভোলা–সহজ সরল)
বোঝেনা মোর জ্বালারে
মোর মনের দুঃখরে কাউয়া কাঁই দিবে তাকে ভুলি॥

পল্লীবধূ স্বামীর বাড়িতে থাকতে থাকতে এক সময় হাঁপিয়ে উঠে। হয়তো বাল্য বিয়ের কারণে মন বসাতে পারে না শ্বশুর বাড়িতে। কাকের কা কা ডাক তার বাবার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। কাক কলার গাছে যখন বসে কা কা করে তখন পল্লীবধু মনে করে এঁটা অশুভ লক্ষণ। তার মনে বাড়ির কথা অর্থাৎ বাবা, মা, ভাই, বোন আশ পড়শি সকলের কথা মনে পড়ে। স্বামীর বাড়িতে তখন তার মন টিকে না। সেই বধু মনে করে গরু বিক্রি করলে যেমন আর গরুকে দেখতে যায় না, ঠিক তেমনি তার বাবা তাকে বিক্রি করেছে। এখানে গ্রাম বাংলায় মেয়ের বিয়ে দেয়াকে অনেকে বেচে খাওয়া বলে বুঝিয়ে থাকেন।

দীঘলনাশী বা দরিয়া ভাওয়াইয়া (৫)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

ছাড়িলেন মোর ময়ারে ময়না
কার কথা শুনিয়া
আগের মতো না কন কথা
হাসিয়া হাসিয়ারে ময়না ছাড়িলেন মোকে॥
কত কথা কইছেন রে ময়না
দিছেন কতো আশা
নিজের কথা নিজে নড়েয়া
মোক করিলেন নৈরাশারে ময়না॥
কোন বা দোষে দেষীরে ময়না
করিলেন মোকে
কি বা বুঝিয়া ছাড়িয়ারে গেইলেন
কি যে দোষী করিয়ারে ময়না॥

কোনও যুবক হয়তো কোনও পল্লীবালাকে মনের অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছে। কোনও কারণে হয়তো তাদের বিয়ে হয়নি। তখন সেই যুবক সেই নারীকে কল্পনা করে গান করে উদাত্ত কণ্ঠে। সে দোষ দেয় ঐ নারীকে, কেননা তার ধারণা সেই নারী তার কথা সে রাখতে পারেনি। সে যুবক মানতে চায়না পরিবেশ পরিস্থিতিকে, ভালোবাসলে মানুষ অন্ধ হয় যায় এ গানে তা ফুটে উঠেছে।

চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া (১)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

বিয়াই খায়া যাও খায়া যাও
মানিক গঞ্জের মান কচু আর
পদ্মার ইলিশ মাছ
ধনিয়া পাতা দিয়া বন্ধু গন্ধে গন্ধে খাও॥
রংপুরের কাঁচা সুপারি
বরিশালের পান
সিলেটের পাথরী চুন গাল ভরেয়া খান
দিনাজপুরের লিচু বিয়াই

রাজশাহীর আম
কুমিল্লার রস মালাই পোড়াবাড়ির চমচম
বগুরার দই বিয়াই
নরসিংদীর সাগর কলা
ময়মনসিংএর আনারস, নাটোরের কাচাগোল্লা॥
সিলেটের কমলা লেবু
যদি বিয়াই খান
সারা জীবন মনে হইবে আমার দেশোত যান॥

আগেই আলোচনা করা হয়েছে চটকা বা চটুল গানে সুরকে প্রাধান্য দেয়ার চেয়ে তাল বা কথাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং চটকা গান দ্রুত লয়ের হয়ে থাকে। যেমন; এই গানটি বিয়াই এর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। বিয়াই, বিয়াইকে তার দেশের কোথায় কি পাওয়া যায় সে এ গানে বর্ণনা করে তাকে যেতে বলেছে।

চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া (২)
কথা ও সুর : রবীন্দ্র নাথ মিশ্র

ওকি বুলবুলির মাও ওকি টুলটুলির মাও, ও তুই না করিস আর আরও
ও তোর কইতে কইতে আচ্ছা কোনা, ভাংছে মুখের পাড়া
তুই হলু ভাকুরা গালী, মোক কইস তুই ট্যারা॥ (ভাকুরা গালী- ফোলা গাল)
ও মোর না হয় ন্যারা চোখটা ট্যারা, তুই কি আরো ভাল্
তোর মোটা মোটা চোখের নাটা টাউয়া টাউয়া গাল। (টাউয়া টাউয়া- উচা উচা)
কোদাল দাঁতী, উঁচু কপালী নাক বোচা তোর থুকরা চুলি (কোদাল দাঁতী- কোদালের মতো দাঁত, থুকরা চুলি –ঘনঘন চুল)
কুলার মতো কান দুইটা তোর তিনটা দাঁতে প্যারা॥
এই খাটো খুমচি বড়াইর বিচি পাইতলে তুই ফ্যার (খাটো-খুমচি খুবই বেটে, পাইতলে-প্রস্তে)
জোর যদি ঢাঙ্গা হবুতা, হবু হাতেক ডের
কমর মোটা কাল্লা সরু চ্যাপ্টা পিটি উল্টা ভুরু
যতই কথা কইস ক্যানে তুই নাই মেলে জোড়া॥

গ্রামে দেখা যায় কিছু সহজ সরল মানুষ নিজের স্ত্রীর উপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে তার স্ত্রীকে কোনও কথা মুখে বলতে পারে না। তাই গানের মাধ্যমে সে তাকে রাগানোর জন্য তার চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া (৩)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

ও সোনা বন্ধুধন দিয়া গেইলোং নিমন্ত্রণ
খায়া আইসপেন হামার গুয়া পান॥
হামার দেশের গরুর গাড়ি নকসা করা ছই
তার ভিতিরা কাঁই আছে এবার শোন কই
নয়া নাইওরী যায় শুনি ভাওয়াইয়া গান
ধরলা তিস্তা ব্রহ্মপুত্র আরো জিঞ্জিরাম
দুধ কুমার আর হল হলিয়া বইছে অবিরাম
সুখে দুঃখে থাকি হামরা জেলা কুড়িগ্রাম।

এই গানটিতে বন্ধু তার বন্ধুকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করার কথা বলেছে। বাড়িতে গেলে পান সুপারি খাওয়ানের পর তাদের প্রাণের গান ভাওয়াইয়া গান শোনাবে এবং এই গানে তার এলাকার গরুর গাড়িতে মূলত নতুন বউ স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি যেতে গাড়িয়ালের ভাওয়াইয়া গান শোনেন সে কথা বলা হয়েছে। নদী তাদের সব কিছুই কেড়ে নিলেও সুখ-দুঃখ শত কষ্টেও ভাগাভাগি করে চলে।

চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া (৪)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

রংপুরিয়া চ্যাংরারে মজালু তোর পীড়িতে (চ্যাংরা - ছেলে)
মোক ছাড়িয়া যাইবুরে তুই থাকিম কেমনে॥
ভাও বুঝিয়া আও কারিস তুই
তাক তো বোঁঝও নাই (ভাও-ভাব, আও-কথা)
কতজনে কথা দিছে, কাঁইও রাখে নাই,
তুই চ্যাংগেরা ছাড়িয়া গেইলে বাঁচিম কেমনে॥
আশা দিয়া তুই চ্যাংগেরা গেলুরে ভাসেয়া
কাড়িয়া নিলু সাধের হিয়া, মুর্চাকি হাসি দিয়া
ছাড়িয়া না যাইস ও চ্যাংগেরা থাকিম তোর সনে॥

এই ভাওয়াইয়া একটি সহজ সরল পল্লীবালার প্রেমের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেননা কোনও এক সময় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিলো অত্যন্ত করুণ। যা আজকের দিনের সাথে তুলনা করলে আশ্চর্য মনে হয়। তার প্রেমিক রংপুর থেকে এসেছে আবার রংপুর চলে যাবে। তার

ইচ্ছা সুখের সংসার বাঁধার। এক সময় তার মনে হয়েছে তার প্রেমিক হয়তো ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রেমিক ছাড়া সে বাঁচবে না সেই চিত্র ফুটে উঠেছে।

চটকা বা চটুল ভাওয়াইয়া (৫)

কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট

সুর : অনন্ত কুমার দেব

নানা হামার হইছে কানা চউখে দেকে না। (চউখে- চোখে)
আগের মতো নানা হামার মেজাজ দেখায় না॥
মাছের মতো মুখ দেখা যায় যদি নানা হানে
ফোকলা দাঁতে খাবার পায় না বসি বসি কান্দে
নানার বগল দিয়া হাতি গেইলে কবার পায় না॥
নানার হাফ ডজন বউ আছিল, কারো সাথে বনে না
নানা বাড়ি বাড়ি কয়া বেড়ায় বউ এর ঘটনা
এই ব্যাকর ব্যাকর করে নানা কাঁইও শোনে না॥ (ব্যাকর ব্যাকর- বেশ কথা বলে)
বয়স কালে ছিল নানার কানায় কানায় সুখ
এই বেশি বিয়া করি নানার মনে অনেক দুঃখ
মনের দুঃখ এ্যালা নানার কাঁইও বোঝে না॥

এই ভাওয়াইয়াটি নানা ও নাতির মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নানার বয়স বেশি হওয়ার কারণে সেই যৌবনের উচ্ছলতা নানার মধ্যে আর নেই। নানার সেই গর্জ্জন এখন নেই, নেই তার সাংসারিক অবস্থা। এই সুযোগে নানার জীবনের সকল ঘটনা নাতি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। আর নানা অকপটে তা স্বীকার করছে। বহু বিবাহের ঘটনাও গানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

ক্ষিরোল ভাওয়াইয়া (২)

কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট

সুর : অনন্ত কুমার দেব

আজি গোসা ন কন ও মোর কালিয়া খুলিয়া কথা কন
কি বা কথায় ব্যাজার হইছেন কালা করিছেন মন॥
ভাত কাপড়ে কী সুখও মেলে, মন না থাকে যদি
ঘুমসী ঘুমসী পুড়ে অন্তর এই অভাগীর মন॥
বন পোড়া যায় সবাইরে দেখে নিভা সে আগুন যায়
তোমরা ছাড়া এই আগুন মোর নিভাইবে কোন জন॥

হাউস সদ্দার কি নাইরে তোর নাই কি কোন সাধ
(হাউস সদ্দার-মুনের লুকায়িত ইচ্ছা)
তোর মনোত কিবা আছে খুলিয়া না কন ক্যান॥

সহজ সরল পল্লীবালার প্রেমের যে আকুতি তা এ গানে ফুটে উঠেছে। কেন না তার প্রেমিকা অনুনয় করে বলতে চাচ্ছে তোমার সব কথা তুমি খুলে বলো তুমি আর অভিমান করো না। আকুতি ভরা হৃদয়ে বলে তুমি বন্ধু রাগ করো না কারণ ভাত খেলে আর কাপড় পরলেই সুখ হয় না। সুখে থাকতে হলে ঠিক তেমন একটি মন থাকা প্রয়োজন। আরও সে বুঝাতে চেয়েছে বনে যখন আগুন লাগে তখন সে আগুন সবাই দেখতে পারে এবং নিভাইতে পারে কিন্তু মনের আগুন কেউ দেখতে বা নিভাইতে পারে না।

ক্ষিরোল ভাওয়াইয়া (৩)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

টোক ধরিয়া আছে বগা মাছের ভিতি চায়া (টোক-নজর, ভিতি-দিকে)
কখন ফাঁন্দি ফান্দ ফ্যালেয়া বগাগ নিবে ধরিয়া॥
ধরলা নদীর পাড়ে বগা আদার খাবার আইসে
উড়িয়া পড়ে সাদারে বগা সকাল আর বৈকালে
আশায় আশায় থাকরে বগা ফান্দ না চিনিয়া॥
বগার মতো মানুষ যেমন থাকে মিছায় আশা নিয়া
ঘর গুজরাণ করে ভাইরে মায়ায় জরেয়া (গুজরান– সংসার)
একদিন ভবের নিলা সাঙ্গ হইবে (যাইবেন) সউগ কিছু ছাড়িয়া॥ (সউগ-সব

কিছু কিছু ক্ষিরোল ভাওয়াইয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর গাওয়া হয়ে থাকে। বককে উদ্দেশ্যে করে বলা হয়েছে বক যেমন ফাঁদে মাছ ধরতে গিয়ে আটকে পড়ে আর পড়লে তার আর নিস্তার নেই। নিশ্চিত মৃত্যু হবে। ঠিক এ দুনিয়া দু'দিনের সব কিছু ফেলে রেখে চলে যেতে হবে এটাই নিয়ম। অযথা মায়ায় বন্দি হয়ে লাভ নাই। কারণ এ পৃথিবী মাত্র দু'দিনের।

ক্ষিরোল ভাওয়াইয়া (৪)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

বালার বাড়ি উলিপুরে (বালা-রমণী)
বান্দিয়া পিরীতির ডোরে
ওকি কন্যাহে কি ময়া নাগেয়া (ময়া-মায়া)
গেইলেন মোকেরে॥
আংড়া ধুইলে কি আর ময়লা যায় রে (আংড়া-কাঠের পোড়ানো কয়লা)

প্রেমের কালী যদি থাকে হৃদেরে
ওকি কন্যারে সেই কালী আর না উঠে জীবনেরে॥
ওরে দুধের সাধ কি ঘোলে মিটে
বাধবেন বাসা দিচেন কথারে
শেষ কালে মোক করলেন নিরাশারে॥
এই যদি তোমার ছিলো মনে
এ ময়া নাগাইলেন ক্যানে
শ্যাষোত কইলেন মোক জনমের বাউদিয়ারে॥

পল্লী বালকের কাঙ্খিত সেই নারী যার সংগে ছোট বেলা থেকে পুতুল খেলা খেলতে মনের অজান্তে ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে। তারা সব সময় স্বপ্ন দেখতো সুখের ঘর বাধার। কিন্তু, না হঠাৎ করেই তার অন্য এলাকায় বিয়ে হয়ে গেছে। সেই পল্লী বালক গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন। সে বুঝাতে চায়, কয়লা ধুলে যেমন তার কালো রং যায় না। ঠিক তেমনি হৃদয়ে ভালোবাসার কালি লাগলে তা আর কখনো উঠবে না। সে বলেছে তুমি যদি চলেই যাবে তাহলে এত মায়া লাগালে কেন।

ক্ষিরোল ভাওয়াইয়া (৫)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

ও সুখের পায়রা রে সুখ বুঝিস তুই
পাখি হয়া বুঝিস পায়রে না বুঝিনু মই॥
কত আশায় করিনুরে পিরীতি,
সুখে থাকার আশে
সেই পিরীতি মোর টলো মলো,
ভ্যালার মতো ভাসে (টলোমলো-টলমল)
ঐ জ্বালায়ে বড় জ্বালা ক্যামনে বুঝিবু তুই॥
সাগরেরো ঢেউরে উতাল পাতাল করে
তবু তারো কুল আছে কুলে আছাড় খায়া পড়ে
মোর জীবনে নাই আর কিছু গেইছে ছাড়িয়া,
না ডুবিয়াও বেড়াও যে মুই সাগরে ভাসিয়া
পাখনা থাইকলে ওরে পায়রা হলু হয় বন্ধু তুই॥ (হলু-হতে)

কবুতরকে বলা হচ্ছে পাখি হয়ে তুমি সুখ বোঝ অথচ মানুষ হয়ে আমি বুঝি না। সুখের জন্য ভালোবাসলাম, সে ভালোবাসা আমার টিকলো না। এ জ্বালা এমন করুণ তা সহ্য করার মতো না। সাগরের ঢেউ যেমন কূলে এসে আছড়ে পড়ে অর্থাৎ সাগরের ঢেউ এর কূল আছে। আমার কোনও কূল নাই। আমার যদি পাখা থাকতো তা হলে তোমার সাথে উড়ে যেতাম।

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া (১)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

উড়িয়া যায়রে সাদার বগা (বগা-বক)
বগা মাথার উপর দিয়া
ওরে জোড়া হারেয়া কান্দেরে বগা
সাথী না পায়রে খুঁজিয়া॥
ওরে জোড়া ভাঙ্গার কিযে জ্বালা জানে
যার গেইছে ভাঙ্গিয়া
তুষের আগুনের মতো জ্বালা
জ্বলেরে ঘুসিয়া॥
দিশা হারা হয়া বগা
যায়রে উড়াল দিয়া
বাঁশের আগালোত পড়ি কান্দে বগা (আগালোত–উপরে)
সাথী হারা হয়া॥

এ ভাওয়াইয়া বকের মাধ্যমে দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে। বক জোড়া হারিয়ে একা একা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যার জোড়া ভেঙ্গে গেছে সেই জোড়া ভাঙ্গার দুঃখ বোঝে তুষের আগুন যেমন আস্তে আস্তে পুড়ে কিন্তু আগুন থাকে প্রখর ঠিক তেমনি জোড়া যন্ত্রণা কাউকে বোঝানো যায় না।

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া (২)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

না কান্দিস না কান্দিস পঙ্খীরে
পঙ্খী বৃক্ষ ডালে পড়ি
তোর পঙ্খীরো নাইরে সাথী
কী হইবে কান্দিয়ারে॥
মনো বান্ধো ওরে পঙ্খী
পাষাণ করো হিয়া
যাঁর যাবার তাই গেইছে ছাড়ি
কী হইবে ভাবিয়ারে॥
সুখ দুঃখ কপালের লেখা
এই দুনিয়ার রীতি

কী হইবে আর অত ভাবিয়া
থাক পাসরিয়ারে॥
বিধির বিধান বোঝা দায়রে
কে খণ্ডাইতে পারে
যতই কান্দিস ওরে পঙ্খী
না আসিবে ফিরিয়ারে॥

পাখিকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া এই গানটিতে সান্ত্বনার কথা ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে সাথী যে হেতু নেই সে জন্য কেঁদে আর কি লাভ। মন শক্ত করে থাকতে হবে। যে যাবার সে তো চলে গেছে। তার কথা ভেবে নিজেকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। বিধি যেটা ঘটাবে সেটাকে কেউ খণ্ডাইতে পারবে না। সুখ-দুঃখ অবশ্যই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া (৩)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

দুঃখের কথা কি কইম সোনারে শোনার মানুষ নাই
কাই আছে মোর শুনবে কথা দিবে মোকে ঠাই॥
পশু পাখি সগার জোড়ারে উড়িয়া বেড়ায় এক সাথে
মোর কপালোত নাইরে জোড়া, দুঃখ সাথে থাকে
যে ডালে ধরোং সে ডাল ভাঙ্গে আটকানোর মানুষ নাই॥
নসিব নোয়ায় ভালো সোনারে মোর কাই ধরিবে হাল
সে জন ছিলো গেউছেরে মরিয়া, করিয়া গেইছে কাল
সোনা একবার আসিয়া সুখের কথা কয়া যারে ভাই॥

গ্রাম্য বালকের ইচ্ছার কথা প্রকাশ পেয়েছে এই ভাওয়াইয়ায়। মনের অজান্তে যুবক ভালোবেসেছে গ্রাম্য বালিকাকে, পরিস্থিতির কারণে বা পারিবারিক কারণে কারো সাথে আগের মতো দেখা হয় না। প্রেমিক ভেবেছে হয়তো সে ভুলে গেছে।

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া (৪)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

তুইরে দেওরা না বাজাইস বাঁশী
আগের মতো নাইরে দেওরা চাঁদ মুখের হাসি
তুইরে দেওরা আলোরে ভালো (আলোরে ভোলা-সহজ-সরল)

পন্থ ছাড়িয়া দেরে দেওরা ডুবি যায় বেলা॥
তুই যদি দেওরা বানিয়া হলু হয়
নোলক বানার ছলে দেওরা দেখিয়া আনু হয়॥
তুই যদি দেওরা গীদাল হলু হলু হয়
গান শুনিবার ছলে দেওরা তোক দেখিয়া আনু হয়॥
ছাড়িয়া দে দেওরা ছাড়িয়া দে আঁচল খান
কাইলকা আইসেন কদম তলায় দেওরা জুরামো পরাণ॥

ভাবী ও দেবরের মধ্যে যে চিরন্তর প্রেম তা, এ ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে। দেবরের বাঁশির সুর ভাবীর কাছে খুবই পরিচিত। বাঁশির সুর কানে পড়লেই মন আনচান করতে থাকে। কাজ ফেলে রেখে ভাবী যখন তখন কাছে যেতে পারে না। সে জন্য ভাবী মনে মনে ভাবে বাঁশি না বাজিয়ে যদি সে গায়ক বা বানিয়া হতো তা হলে গান অথবা নোলক বানার ছলে তাকে দেখে আসতো। তারপরও সে বিকাল বেলা আসতে বলেছে মনের কথা বলে পরাণ জুড়াবে।

বিচ্ছেদী বা চিতান ভাওয়াইয়া (৫)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

বসন্ত চলিয়া গেল আইসপে বছর ঘুরি
ও তুই না কান্দিস কোকিলারে আর
ঐ বৃক্ষ ডালে পড়িবে কোকিলা কান্দিস বা ক্যানে॥
ওরে যখন রে তুই কাঁন্দিসরে কোকিলা বৃক্ষ ডালে পড়ি
ও মোর মনের আগুন ঘুমসি জ্বলে আগুন
নিভাইম ক্যামন করিরে কোকিলা কান্দিস বা ক্যানে॥
ওরে রাত্রি নিশা কালে কোকিলারে, যখন উটিসরে কান্দি
ওরে জোড়া ভাঙ্গার দরুন ব্যথা তখন
মনে উঠে জাগিরে কোকিলা কান্দিস বা কানে॥

বসন্ত কাল এমন একটি সময় সে সময় মানুষ পশু পাখি সকলের পছন্দের সময় এ সময় কোকিল যখন বনে ডাকে তখন নারী যৌবনের সকল স্মৃতি মনে পড়ে। কোকিলের ঐ ডাকে নারী জীবনের সব দুঃখ নতুন করে জেগে উঠে বিরহের জ্বালা আর না জাগাই ভালো। এ জ্বালা নিভানোর কেউ নাই।

মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া (১)
কথা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

তোমরা গেইলে কী আসিবে
মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তি চড়াঁন হস্তিরে নরাঁন
হস্তির গলাত দড়ি
ওরে সত্যি করিয়া কন হে মাহুত
কোনবা দেশে বাড়িরে॥

এই মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া গ্রাম্য বালার মনের কথা স্থান পেয়েছে। মাহুত বন্ধুকে দেখে সে তার পরিচয় জানতে চেয়েছে সে তার মনের আকুতি প্রকাশ করতে পারে না। তাই সে মনের কথা বলার মানুষ খুঁজতে থাকে। এক সময় সে মাহুত বন্ধুকে মনের মানুষ মনে করে তাকে সব কথা বলতে চায়।

মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া (২)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

নদীর ধার দিয়া মাহুত বন্ধু যায়
ঘাড়ের গামছা দেখা যায়
না দেখে বন্ধু পিছন ফিরিয়া॥
যায়রে বন্ধু হস্তি ধরি
হস্তির শুরের মতো মন বান্ধি
মনের কথা মুই ক্যামনে কইম বুঝিয়া॥
আশ পাড়শি জ্বালায় মোক
দুঃখের কথা কাকে কঁও
যাঁয়বা আছে তাঁয় থাকে না বোঝর ভান করিয়া॥

মানুষকে চেনা যায় ভিন্নভাবে। এ ভাওয়াইয়ায় দেখা যায় একজন নারী অন্তর থেকে তাঁর বন্ধুকে দেখতে পায় এ গানটিতে। ঘাড়ের গামছা দেখে সে বুঝতে পারে তার মাহুত বন্ধু চলে যাচ্ছে। হাতির শুড় যেমন শক্ত থাকে নারী মনের ধারণা বন্ধু মনও ঠিক তেমনি শক্ত সে মনের কথা বোঝে না। তাই সে তার দিকে দেখেনা বা মনের কথা বলে না।

মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া (৩)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

বন্ধু গেইল মোর ঐ না বনে রে
ও তাঁই হস্তি ধরিবারে
আসুক বন্ধু ভালে ভালে রে
ও মুই সিন্নী দেইম মুই দরগাতে॥
আসিলো আষাঢ় মাস রে
গিজ্জি আইসপে ঝড়ি
কোনটে যাইবে কোনটে থাইকপে বন্ধু মোর
না পাও ভাবি রে॥
আইতের বেলা বনোত বাগ ও,
তাই হংকার ছাড়ে
কি করিবে সোনা বন্ধু মোর
মন মোর কান্দি কান্দি মরে॥
এবার যদি আইসে বাড়িরে
ও মুই খুলিয়া কইম তাকে
এবার দুঃখ বুঝলে বন্ধু মোর
না যাইবে আর ফ্যালে রে॥

নারী মনের কষ্টের কথা, বেদনার কথা, এ গানে ফুটে উঠেছে। কারণ বন্ধু যদি বনে যায় অনেক দিনের জন্য হাতি ধরতে, সেখানে অনেক বিপদ হতে পারে। কেন না আষাঢ় মাসে বৃষ্টি নামলে সে কোথায় থাকবে, কেমন করে থাকবে, সে জানে না। বন্ধু যদি ভালোভাবে থাকে এ কথা শোনার পরও সে শীননী করে দরগাতে দেবে। এ গানে গ্রাম বাংলার আসল চিত্র ফুটে উঠেছে।

মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া (৪)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

হাতির উপর থাকে সোনা মোর
হাতির মতো মন
বন্ধু ছাড়া এই জগতে
নাইরে কোন জন॥
দুরন্তরে সোনা যখন কয়রে মোরও কথা
কলিজা কাঁপিয়া উঠে, জুড়ায় মনের ব্যথা
ফিরি আইলে কতা হইবে রে যাইবে দিনক্ষণ॥
খাবার সময় মাঝে মধ্যে জিহ্বায় কামড় দেঁও
সোনারও হামার অদন হয়রে খুলিয়া তোমাক কঁও
তার লাগিয়া তুলিয়ারে থুইছোঁও এই হৃদয় মন॥

আপন কেউ বাইরে গেলে বাড়ির লোক জনের কথা মনে পড়ে। ঠিক তেমনি বাড়ির লোকজনও প্রতিনিয়ত তার কথা ভাবে। যা সচরাচর লক্ষ করা যায়। এ গানে তা ফুটে উঠেছে।

মাহুত বন্ধুর ভাওয়াইয়া (৫)
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

আইমোর সোনারে হামার বাড়িতে আইজক্যা
সোনা মোর হাতি আসিবে
বাজান এ্যালা হইচে হাতির মাহুতরে॥
হাতি আইসপে হামার বাড়িত
খুলিতে খাড়াইবে
কলার পাতাত ভাত দিমো হামরা
বাজান তাক খাওয়াইবে॥
কালা হাতি, লাল হাতি, আরো আছে ধওলা
হামার বাড়িত গড়ামো আইজকা
বড় করি মলা হাতি খাইবে হামরাও খামো
প্যাট ভরি যাইবে॥

এ ভাওয়াইয়া শিশু মনের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। কেন না বাবা হাতির মাহুত হয়েছে, এটা খুবই খুশির ব্যাপার। হাতি বাড়িতে এলে বাড়ির সবাই হাতিকে খাবার দিবে। এমন কি, মোয়া (মলা) দিয়ে হাতির পেট ভর্তি করে দিবে। এ শুধু শিশু মনের কল্পনা।

ভাওয়াইয়া গানের স্বর্ণযুগ

১৯৩০ সালে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানি চালু হয়। তার পর থেকেই ভাওয়াইয়ার উত্থান শুরু হয়। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ বসুনীয়া "ও বাড়ির নতুন বউ আসিয়া" এবং "পরশী আপন নয় বান্ধবরে" এ দু'টি ভাওয়াইয়া গান প্রথম রেকর্ড করেন। তখন ঐ একখানা রেকর্ড বাংলাভাষী এলাকায় এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং ব্যাপক সাড়া জাগায়।

এরপর ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন, নায়েব আলী টেপু, কেশব বর্মন, প্যারীমোহন দাস, গঙ্গাধর বর্মন, যত্নেশ্বর বর্মন, ধনেশ্বর রায়, কেদার চক্রবর্তী, বিরজা মোহন সেন, শত শত ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করতে থাকেন এবং ভাওয়াইয়া মুদিরা তা সাগ্রহে গ্রহণ করতে থাকেন। (তথ্য সূত্র সুখ বিলাস বর্মা "লোকসঙ্গীতে কোচবিহার")

ভাওয়াইয়া গান থেকে কৃষ্ণধামালী। তা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত আসল ও অপর শ্রেণির নাম শুকুল (শুক্ল)। এই কৃষ্ণধামালী যে, বঙ্গদেশের জনসাধারণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনবার তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাচীন রাজবংশী জাতি ও যোগীরা বাংলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকাগুলো এখনও রক্ষা করে আসছেন। শুক্লা কৃষ্ণধামালীকে সুন্দর করে সাধু ভাষা প্রবর্তিত করে কবিত্ব মণ্ডিত করে চণ্ডিদাস কৃষ্ণ কীর্তন লিখেছেন। যদি কৃষ্ণ কীর্তন না পেতাম তবে বুঝতাম না গীত গোবিন্দ ও কৃষ্ণ ধামালীর পরেই হঠাৎ চন্ডীদাসের আবির্ভাব কি করে হয়েছিল।

এ উক্তি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। দেখা যায়, ভাওয়াইয়া গানগুলো হতে বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্ট হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী হতে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান সৃষ্টি হয়নি। কারণ উত্তরবঙ্গের পল্লীতে বৈষ্ণব পদাবলী অজ্ঞাত।

কিসের মোর রান্ধন, কিসের মোর বাড়ন,
কিসের মোর হলদি বাটা
মোর প্রাণনাথ, অন্যের বাড়ি যায়,
মোরে আঙ্গিনা দিয়া ঘাটা॥

উপরের এই ভাওয়াইয়া গানটির প্রতিফলন নিম্নলিখিত বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়।

সখি কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ি যায়,
আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥

আবার

তুই মোরে নিদয়ার কালিয়ারে,
ও তোর দয়া নাই পরাণেরে
ও মুই বিছানা ঝরিয়া, বিছানা পাতিনু,
মশারী টাঙ্গানুরে
ও মোর কালিয়া, শোওয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে॥

এই ভাওয়াইয়া গানটির প্রতিফলিত পাই বৈষ্ণব পদাবলী বধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু গাঁথিনু ফুলের মালা।

ভাওয়াইয়া গানের বয়স

সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েছেন ভাওয়াইয়া গান কোচবিচার ও তৎ পাশ্ববর্তী অঞ্চলের রাজবংশী বা কামরূপী ভাষায় গীত দীর্ঘছন্দের ও বিলম্বিত তালের লোকসঙ্গীত। যার মাধ্যমে পাওয়া যায় রাজবংশীদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ও লোকায়ত জীবনের অভিব্যক্তি। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজবংশীদের উত্থানের সময় ইহা এলাকা ভেদে প্রসার লাভ করে ছিল। তবে নিগ্রোবুট জাত, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আলপীয়, সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা, যাযাবর, জাতীয় ভাষা ভাওয়াইয়ায় নেই তা বলা ঠিক হবে না। কেননা ইতিহাসবিদদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৫ বা ১০ হাজার বছর আগে সেই জাতির ভাষার সাথে আজকের ভাওয়াইয়া ভাষার অনেক ভাগ মিল রয়েছে। সঠিকভাবে ভাওয়াইয়ার বয়স জানা না গেলেও এটাই প্রমাণিত হয় ভাওয়াইয়া গান যে হাজার বছরের পুরনো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্লেখিত ৬ প্রকার ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরনের গান লক্ষ করা যায়, যেমন, পশু, পাখি, মাছ, মানুষ, বন্যা, খরা, রোগ, ফুল ও ইত্যাদির উপর যে গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে সেগুলো ঐ ৬ প্রকার গানের অংশ বিশেষ।

মাছের উপর ভাওয়াইয়া

রচনা ও সুর : কছিমুদ্দিন

ও হো.......
বড় বাপই, মাইঝলা বাপই, ছোট বাপই ও
নয়া ডাড়াদি মাছ উজাইচে
হ্যাঙ্গা পাতেয়া থো॥
শাওন মাসি দিনরে বাপই
টিপটিপানি ঝড়ি, বাইপরে টিপটিপানি ঝড়ি
বিয়ানে উঠিয়া গেইছোং সল্লার দোলা বুলি

মাছ ও উজাইছে বাপই নানান জাতি
ধুতুরা, চান্ধা, খড়িকাটি
কতো শাল, বোয়াল, রুই, কাতলা, চিতল খাড়িয়া কৈ, চেলা
বাউস নাদিম, হইল মিরিকা, ঘোরেয়া আর কেন ইলিসা
শংকো মাছ আর পুটিতর, আইর ভ্যারুস, পাংগাস, কচা
গাগলা, পোগল, ঘারুয়া, বাচা, কত্তি, মওয়া, পুটি, ট্যাংন্যা
জাওয়ারী নেওয়ারী, ভাংনা, এ্যালংগা কুসস্যা, ঢ্যারুয়া
টিপালু আর প্যাট উরুয়া, ডারিকা, স্যাবলাই, খাটা
কটকটিয়া, বালা চাটা, শিংগী, মাগুর, কৈ খলিশা
শ্বেত কৈ আর পাবো, বালিয়া, গতা পিয়া, বাইম, কুচিয়া
চ্যাং, চ্যাংগা উপচৌকা, মাছ নাগিল ঐ হ্যাঙ্গাতে
নয়া ডাড়াদি মাছ উজাইছে হ্যাঙ্গা পাতেয়া দে॥

(মাইজলা-মধ্যম, বাপই- ছেলের বা ছেলের সম্বন্ধীয় কেউ, নয়া-নতুন, ডাড়াদি-নালা দিয়ে, হ্যাঙ্গা-এক ধরণের মাছ ধরার জাল, শাওন মাসি-শ্রাবণ মাসে, টিপটিপানি ঝড়ি-টিপটিপ করে বৃষ্টি)

মাছে ভাতে বাঙ্গালি এর সার্থকতা দেখা যায় এ ভাওয়াইয়ায়। বাংলাদেশের নদী নালা, খাল বিল, হাওর, বাওর, ও পুকুরে কত মাছ আছে তা এ ভাওয়াইয়ায় লক্ষ করা যায়। এমন কিছু মাছের নাম উল্লেখ আছে তা হয়তো আমরা অনেকেই খাওয়াতো দূরের কথা কোনোদিন দেখিনি। এ ভাওয়াইয়ায় মাছ ধরার ফাঁদ, ড়ারকী এবং হ্যাঙ্গা জালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো এখন প্রায় বিলুপ্ত।

পাখির উপর ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : কছিমুদ্দিন

বাপই নালাটুরে নানান জাতের পাখি দ্যাশোত
শোনেক কঁও তোকে।
চায়া দেখেক বাপই বনের পাকে
ঝাঁকে ঝাঁকে কতো পাখি উড়ে
চায়া দেখেক বাপই বনের ভিতি
নানান জাতের কতো পাখি দেখি
কতো সারী, শুয়া, তোতা, ময়না,
কাজলা, মইয়ুর কাগাতুয়া,
স্যারা, টিয়া, ধুপনী, চিলা

সগুন, কাউয়া, বাজ, কুরুয়া,
ধনেশ পাখি, হারগিলা,
মাছরাঙ্গা আর গাংচিলা
ঘুঘু, কইতোর, হইল কুরুয়া,
জটা, কানি, বগা, উরো,
গাঙ সারো, গবরী সারো
ফিংগে, কদোমা, মণি,
গোঙরা, দইয়ল, টুনটুনি,
কাইয়া, কোড়া, দল কবরী
কানি বগা আর দল কবরী,
বাওয়াই আর হারিয়া চেঁচা,
গোদম, বাদুর কাল পেঁচা
পাখি নাগিল ঐ গাছোতে,
নানান জাতের পাখি দ্যাশোত, শোনেক কঁও তোকে॥

আমাদের এ দেশে গাছের ডালে পাখি মধুর সুরে গান করে। নানান জাতের পাখি বাস করে আমাদের এই প্রাণের দেশে। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এতো পাখি আছে কি'না আমার জানা নেই। এ ভাওয়াইয়ায় পাখির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকৃত পাখি হয়তো আমরা আর এখন দেখি না। আর যে গুলো দেখি তাও হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যে বৈরি পরিবেশ ও আবহাওযার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বন্যার উপর ভাওয়াইয়া
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

বান আসিলো রে ও বান আসিলো রে
উজান থাকিয়া ও বান আসিলোরে॥
উজান থাকি আসিলো বান, ভাসিয়া গেলো বাড়ি
উচা যাগা দেখিয়া সগাই ধাপাড় নিলোং তুলি
ফৈলান হইছে বানের পানি, সতেয়া দেওয়াব ঝরি
এবার বানের ঠেলায় কোকরা নাগিল যত বড়াবুড়ি॥
ভালো ঘাটা ভাঙ্গিয়া করিল, নিদারুনো কুড়া
এঘর ওঘর করতে নাগে কলা গাছের ভুড়া
ভাসিয়া গেলো ভেড়া ছাড়ল, আরো দুধাল গাই
হামরা বোলে না পাই খাবার, মারা বুঝি যাই॥

(উচা-উঁচু, যাগা-জায়গা, সগাই-সবাই, নিলোং-নিলাম, দেওয়া-আকাশ, কোকরা-জড়োসড়ো, হামরা-আমরা, বোলে- বোধহয়)

বন্যা বাংলাদেশের অভিশাপ। বন্যায় মানুষের কি দুর্ভোগ হয় তা এ ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে। মানুষ বন্যায় কতো অসহায় তা এ ভাওয়াইয়ায় অনুমান করা যায়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ ভাওয়াইয়া এলাকার মানুষ বন্যার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে।

মানুষের নামের উপর ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : কছিমুদ্দিন

ও দেওয়ার হুরকা আইলোরে চলো আম কুড়িবার যাই
কাঁচা আম পাকা আম, থুবার যাগা নাই।
দেওয়ার হুরকা আইলোরে॥
কাঁইও নিলো সিন্নার বোন্দা কাঁইও নিলো বাতি
কারো মাথাত ঝাঁপিরে ভাই কারো মাথাত ছাতি
হুরাহুরি জুরাজুরি করিয়া কুড়াই আম
এবার শোন আম কুড়্যাইলা চ্যাংড়া গুলার নাম
এই জংলু, মংলু, টগরু আর বিশারু, ভগলু, শুকারু, কান কাটা ভুলু
অমদ্দি, জমদ্দি, ছমদ্দি আর মনোদ্দি, সজাল বাউরা, জয়নুল্যা পাগলা,
উমর আলী কামলা, পাছোত আসিল নেম ঝ্যালা, তাঁইও কুড়াইল এক ছালা
আরো কতো আছে পড়ি ভাই॥
ওরে কাঁচা আম পাকা থুবার যাগা নাই
ও দেওয়ার হুরকা আইলো রে॥

(হুরকা-ঝড়) (কাঁও - কেউ, সিন্নার বোন্দা-পাটখড়ির বোঝা) (ঝাঁপি-মাথাল, ছাতি-ছাতা)

হুবকা অর্থাৎ ঝড়ের কথা উল্লেখিত ভাওয়াইয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ের দিনে গাছ থেকে আম পড়ার সময় বাস্তব চিত্র এ ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে। বৃষ্টি এলে বা রাতের বেলা কেমন করে আম কুড়ানোর জন্য পাট খড়িতে আগুন লাগিয়ে আম কুড়ানো হতো তার কথা হয়তা কিছুদিন পর মানুশ ভুলে যাবে। কিন্তু এ ভাওয়াইয়ায় তা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। একই গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো কে কে আম কুড়াতে যেতো তাদের নাম এ ভাওয়াইয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশাত্ববোধক ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : মহেশ চন্দ্র রায়।

সোনা ফল্যাও দ্যাশের মাটি আমার সোনার দ্যাশ
এই মাটিতে তের ফসল ফলাই বারো মাস
ভাইরে ফলাই বারো মাস
ভাইরে ফলাই বারো মাস॥
উছলে পড়ে ধানের গোলা গোয়াল ভরা গাই।
দইয়ে দুধে মাছে শাকে দোনো বেলাই খাই।
ধন্য হামার দ্যাশের মাটি ধন্য হামার দ্যাশ॥
হামার দ্যাশের মাটিরে ভাই সোনার চাইতে খাঁটি
মনের সুখে খাইরে হামার দুধ ঘটি ঘটি
হামার মাটি হামার বায়ু সুখেই মোদের বাস॥

এ ভাওয়াইয়ায় বাংলাদেশের প্রকৃতি কত সুন্দর, মাঠে মাঠে সোনা ফলে। বারো মাসে তের ফসল ফলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধানের গোলায় ধান উছলে পড়তো, দই, দুধ, মাছ, শাক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত তা সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সুখের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

ফুলের উপর ভাওয়াইয়া
কথা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

ও ভাই হামার দ্যাশর মাঝে
নানান জাতের ফুল ফোটে ভাই
কও তোমার আগে॥
এমন সোনার দেশ এই দুনিয়াত আর কোথাও নাই
ধন্য মোরা জন্মেছি তাই এই দেশেরো পরে॥
কি কি ফুল আছে ভাই মন দিয়ে শোনো সবাই
গোলাপ, জবা, টগর, কড়ি,
হাসনা হেনা, জুঁই চামেলী,
সূর্যমুখী, পলাশ পরাগ
গেন্দা, বকুল, দোলন, চাঁপা,

কোটরাজ, মাধবীলতা
ধতুরা, পদ্ম, ওর ফুল,
কাঞ্চন রঙ্গণ, শিমুল,
কৃষ্ণচূড়া মালবিকা,
কচমচ, চন্দ্র মল্লিকা,
তারাফুল আর শেফালী,
শাপলা কুন্ধ করবী
এলা মণ্ডা চম্পা বেলি,
কাঠালী চাঁপা, কলাবতি,
সরিষা, মরিচ, ঘাস, ফুল,
চাঁপা হিজল পানা ফুল
তমাল কেয়া, কলমিলতা,
দোপাটি, অপরাজিতা
যুথী, মান্দার, স্থল পদ্ম,
সন্ধ্যা মালতি নীলকণ্ঠ,
বাগান বিলাস, কামিনী,
ডালিয়া জেসমীন যামেনী
যামিনি বিস্কুট, অতসী,
চেরী, শিউলী, মালতী
আরও অনেক ফুল আছে ভাই
এমন সোনার দেশ হামার দুনিয়াত কোথাও নাই॥

এ গানটিতে বাংলাদেশের নানান ধরনের ফুলের নাম উল্লেখ আছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এ দেশের প্রকৃতির কথা এ ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে।

কিছু প্রাচীন ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

আবো নওদাড়ীটা মরিয়া মোরসেন হইছে হানি
আঁধার ঘরোত পড়ি থাকোং পড়ে চউখের পানি
আবো টাপ্পাস কি টপ্পুস করিয়া॥
আবো সগায় বেড়ায় টারি টারি, লাল শাড়ি পিন্দিয়া

তোলা আছে ঢাকাই শাড়ি কাঁয় যাইবে পিন্দিয়া
ও কি খস্যোর কি মস্যোর করিয়া॥
আবো আশ-পড়শী নাইওর যায় দোকোল জুড়িয়া
মোর নওদাড়ী থাকিল হয় লাল শাড়িখান পিন্দিল হয়
পাছোৎ গেইল হয় চালালাৎ কি চালালোৎ করিয়া॥
আবো আসিলো যে, গরম কাল শুইয়া নিদ্র যাঁও
মোর নওদাড়ী থাকিল হয় বগোলোত বসিল হয়
গাও হাকাইল হয় ক্যাররোৎ কি কোরবোৎ করিয়া॥
আসিলো যে, বর্ষাকাল মাছ মারিয়া আনুন হয়
মোর নওদাড়ীটা থাকিল হয় বগোলোতে বসিল হয়
মাছ কুটিল হয় ঘ্যাচ্চোৎ কি ঘোচ্চোৎ করিয়া॥
আবো মোর নওদাড়ী মরিয়া মোরসেন হইছে দুখ
নদীর কাছারের মতো ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক
ওকি দাড়ারাম কি দিড়িরাম করিয়া॥

তবে মুস্তফা জামান আব্বাসী লিখিত মেঠোসুরের দিগন্ত: বেতার কথিকায় এবং রংপুর গেজেটিয়ারে দেখা যায় গানটি ২০০ (দুই শত) বছরের পূর্বে রচিত হয়েছে। ১৭ শতকের শেষের দিকে রংপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার Sir George Greearson তিনি এ গানটি উদ্ধাব করেছেন এবং চল্লিশের দশকের ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন গানটি গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন।

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : নায়েব আলী টেপু

ওরে ধিক ধিক ধিক মৈষাল
ধিক গাবুরালী
এহেন সুন্দর নারী
কেমনে যাইবেন ছাড়ি মৈষাল রে॥
ওরে তোমরা যাইবেন মৈইষের বাতানে রে
মৈষাল আমার বাদে কি
তোমার পেন্দনে শ্যামলাই ধুতি
আমার দাঁতের মিশি মৈষাল রে॥

এ গানটি ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার এলাকার নায়েব আলী টেপু গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন। এ গানটির কোনও গীতিকার বা সুরকারের নাম জানা যায় নি। গানটি যে, শত বছরের পুরনো তাতে কোনও সন্দেহ নাই। (তথ্য সূত্র: ভাওয়াইয়া-মুস্তফা জামান আব্বাসী)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : নায়েব আলী টেপু

ওরে আগা নাওয়ে ডুবো ডুবো, পাছা নাওয়ে বইসো
ঢোঙ্গায় ঢোঙ্গায় ছ্যাকোং জলরে, কন্যা পাছা নাওয়ে বইসো॥
ওরে জল ছেঁকিতে জল ছেঁকিতে সেঁইতির ছিড়িল দড়ি
গলার হার খসেয়া কন্যাহে, কন্যা চেঁউতিত নাগাইম দড়ি
গলার হার খসেয়া কন্যাহে॥
ওরে তোক সে বলোং ছাওয়াল কানাই, তোর সে ভাঙ্গা নাও
ভাঙ্গা নাওয়ের খেওয়া দিয়ারে, ও তুমি কেমন মজা পাও
ভাঙ্গা নাওয়ের খেওয়া দিয়ারে॥

ওরে ভাঙ্গা নোয়ায় ছেঁড়াও নোয়ায়, সোনা রূপায় গড়া
রাজার হস্তিক পার করিছোং রে ও কন্যা, তোর বা কতো ভরা
রাজার হস্তিক পাড় করিছোং রে॥

ওরে এক সুন্দরীক পার করিতে, নিছোং আনা আনা
তোক সুন্দরীক পার করিতে রে ওকন্যা খসাইম কানের সোনা
তোক সুন্দরীক পাড় করিতে রে॥

ওরে সোনাও খসাইম রূপাও খসাইম, খসাইম কানের সোনা
ভরা গাঙ্গের খেওয়া দিয়ারে, ও কন্যা শরীল হইল মোর কানা
ভরা গাঙ্গের খেওয়া দিয়ারে॥

নদী মাতৃক আমাদের এ দেশের এ সময় যাতায়াত ব্যবস্থার এক মাত্র বাহন ছিল নৌকা। নৌকায় পানি উঠলে যে, ছেঁচতে হয় তা এ গানে উল্লেখ আছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয় রাজা রাণি এবং রাজার হাতিও এই নৌকায় পারাপার হয়েছে তা এ ভাওয়াইয়ায় স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। গানটি আব্দুল করিম, লালমণিরহাট জেলার মোগলহাটের কাশেম আলীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। সূত্র-ভাওয়াইয়া-ওয়াকিল আহমেদ

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : নায়েব আলী টেপু

কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে॥
যদি বন্ধু যাবার চাও
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে॥
বট বৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোরাও বন্ধুর মায়া তেমন রে
বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে॥

এ গানটিও অনেক পুরনো বলে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। চল্লিশের দশকে ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন সংগ্রহ করে রেকর্ড করেন। গানটির রচয়িতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভাওয়াইয়া
রচনা : আবদুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

আদি নদী না যাই রে বৈদ, নদী না যাইও রে বৈদ
নদীর ঘোলারে ঘোলা পানি॥
নদীর বদলের বৈদ, বাড়িত ধোন গা রে বৈদ,
আমি নারী তুলিয়া রে দিব পানি।
(আজি) এক লোটা তুলিয়ারে বৈদ
আর এক লোটা তুলিয়ারে বৈদ
ছিঁড়িয়া পইল মোর গলার চন্দমালা॥
তোরষা নদীর পারে রে বৈদ
রাজহংস পঙ্খী কাঁদে রে বৈদ,
পঙ্খীর গলায় গজমতির মালা॥

এ ভাওয়াইয়া গানটি রচয়িতা ত্রিশ এর দশকে রচনা করেন। আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে গানটি রেকর্ড হবার পর বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। গানটি হয়তো অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে। কেননা নারী মনের বাস্তব চিত্র এ গানে যেভাবে ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত বাস্তব ও স্বাভাবিক।

ভাওয়াইয়া
রচনা : আবদুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

ও মোর কালারে কালা
ও পাড়ে ছকিলাম বাড়ি, কলা রুইলাম কালা সারি সারি রে
কালা কলার বাগিচায় ঘিরিলো সেই না বাড়ি রে॥
ওমোর কালারে কালা
কলার খোপে খোপে গুয়া রুইলাম কালা থোপে থোপে রে
কালা গুয়ার গোড়ে গোড়ে পান দিলাম গাড়ি রে॥
বাইরা খোলন ভরি বেল চম্পা কালা দিলাম গাড়ি রে,
কালা ফুলের মালা আমি দিবো বন্ধুর গলে রে॥
বাড়িটার দক্ষিণ খোলা পূর্ব দিকে কালা সাধুর দোলা রে
কালা সেই না দোলা শাওনে ভরে রে॥
পতিধন মোর দূর দ্যাশে মৈলাম পৈল কালা চিকন ক্যাশে রে
নারীর হিয়া বল কতই ধৈরযো ধরে রে॥

এ ভাওয়াইয়া গানটি একটি আদর্শ বাড়ির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুপারী গাছের গোড়ায় পান গাড়ার কথা বলা হয়েছে যা বাংলার প্রতিটি বাড়িতে দেখা যায়। প্রবাদ আছে দক্ষিণ দুয়ারী বাড়ির রাজা, উত্তর দুয়ারী তার প্রজা, পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই, পূর্ব দুয়ারীর খাজনা নাই। এ গানে বন্ধুর সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারণে বাড়ির সমস্ত বর্ণনা এ ভাওয়াইয়ায় তুলে ধরা হয়েছে।

ভাওয়াইয়া
রচনা : আবদুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

একবার আসিয়া সোনার চাঁদ মোর যাও দেখিয়া রে॥
অদিয়া অদিয়া যান রে বন্ধু ডারা না হন পাড়
ও হো রে থাউক বোল তোর দিবার থুবার দেখায় পাওয়া ভার রে॥
কোড়া কান্দে কুড়ি কান্দে কান্দে বালিহাঁস
ও হোরে ডাহুকের কান্দনে আই মুই ছাড়নু ভাইয়ার দ্যাশ রে॥
লোকে যেমন ময়নারে পোষে পিঞ্জিরায় ভরিয়া
ও রে বাপো মায় বেচেয়া খাইছে, সোয়ামী পাগেলা রে॥

গ্রামের মানুষ যে, কতো সহজ সরল তা এ ভাওয়াইয়ায় দেখা যায়। নারী মনের আকুতি এ গানে ফুটে উঠেছে। বিয়ে দেয়াকে বেঁচে খাওয়া বলা হয় যা এখনো গ্রামে গঞ্জে শোনা যায়। নারী মনের সুপ্ত বেদনা এ গানটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

বৃটিশ বিরোধী ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে
চতুর্দিকে জ্বলে সূরুয বাতি,
তোমরা ক্যানে আঁধার রাতি রে॥
হায়রে হায়, পরের বোঝা তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥

বালুটিটি পংখী কাঁদে নিজের আহার খুঁজির বাদে রে
হায়রে হায়, তোমরা বুজি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥

এক বেলা তোমার অন্ন জোটে, পেন্দোনোত তোমার কাপড় কোনঠে রে
হায়রে হায়, তোমরা বুঝি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥

তোমাব হাতোত ভাইরে কোদাল কাঁচি
তবু প্যাটে পাথর বাঁধি আছেন বাঁচি রে, আর তোমরায় জোগান ভাত সর্ব দুনিয়ার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥

এ ভাওয়াইয়া গানটি ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় "গাঁওয়ালিয়ারে" স্থানে "বাঙ্গালিরে" করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শত শত বার প্রচার করে মুক্তিপাগল মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
ওরে ঐ মতো মোর গাড়ির চাকা পন্থে পন্থে ঘোরে রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলোং রাজপন্থে॥

বিয়ানে উঠিয়া গরু গাড়িত দিয়া জুড়ি
ওরে সোনা মালার সোনা বাদে চাঁদে দ্যাশে ঘুরি রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলোং রাজপন্থে॥

গাড়ির চাকা ঘোরে আরো মধ্যে করে রাও
ওরে ঐ মতো কাঁপিয়া উঠে আমার সর্ব গাও রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলোং রাজপন্থে॥
দ্যাশে বিদেশে বেড়াঙ রে মোর সোনার সোনা বাদে
ওরে সেও সোনা অবশেষে ঘরোৎ বসি কান্দে রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলোং রাজপন্থে॥
(চলোং–চলি বাও-কথা, গাও-গা)

উল্লেখিত ভাওয়াইয়া গানটি সৃষ্টি থেকেই খুবই জনপ্রিয়। একজন গ্রাম্য সহজ সরল গাড়োয়ানের না বলা কথা এ ভাওয়াইয়ায় স্থান পেয়েছে।

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

পতিধন, প্রাণ বাঁচে না যৈবন জ্বালায় মরি
খোপেতে নাই রে কইতর কী করে তারে খোপে
যে নারীর সোয়ামী নাইরে কী করে তার রূপে॥
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কী করে তার তারা
যে, নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে আন্ধিয়ারারে॥
নদীর বসন্তকালে পুরুষ গলার কাঠি
নারীর বসন্ত কালে মুখে মুচকি হাসি
পুরুষের বসন্ত কালে হাতে মোহন বাঁশী॥
মাছের বসন্ত কালে করে উজান ভাটি
আমি নারী একলা ঘরে করোং কাঁদাকাটি॥

স্বামী ছাড়া স্ত্রী কত অসহায় তা এ গানটিতে লক্ষ্য করা যায়। কবুতর ছাড়া যেমন কবুতরের বাসা বেমানান ঠিক তেমনি রূপ থেকে লাভ নেই যদি স্বামী কাছে না থাকে। আকাশে চাঁদ না থাকলে তারা দিয়ে যেমন আলো ছড়ানো সম্ভব না, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর ঘর তেমনি অন্ধকার হয়ে থাকে।

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করীম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

ওরে গাড়িয়াল বন্ধুরে
বন্ধু ছাড়িয়া রইতে পারি না রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে॥
বন্ধু গাড়ির চাকায় ভরেয়া গান
অদিয়া অদিয়া চলিয়া যান রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে॥
বন্ধু তোমার মুখের ভাওয়াইয়া গান
পাগল করে আমার প্রাণ রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে

তোমার বন্ধুর কঠোর হিয়া
বুঝাইতে না বোঝে হিয়া রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে॥
বন্ধু বটের গাছে ঘুঘুর বাসা
তোমার বন্ধুর কিসের আশা রে
ওরে গাড়িয়াল বন্ধু রে॥

নারী মনের উপচে পড়া ভালোবাসা ও ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে। ভালোবাসার মানুষের সব কিছুই ভালো লাগে, এ গানে তা লক্ষ্যণীয়। গরুর গাড়ি চলার সময় চাকার শব্দও নারী মনকে বিচলিত করে। গাড়িয়াল বন্ধুর গান নারী হৃদয়ে কেমন তরো স্থান পেয়েছে এ গানে তা অনুমান করা যায়।

ভাওয়াইয়া
রচনা : গঙ্গাচরণ বিশ্বাস
সুর ও শিল্পী : গঙ্গাচরণ বিশ্বাস

ওকি সাঙনা মারিলু ক্যানে
ভাতের দুঃখে ওরে সাঙনা, কাইনোত বসিনু মুই
কোন দোষেতে দুয়ার বান্দিয়া মারলু আজি তুই॥
পূবের ঘরে মারিতে মারিতে আন্দোন ঘরোত আনিলু
ভাত আন্দা হাড়ি-পাতিল ন্যাদেয়া ভাঙ্গিলু॥
মোক মারিলু ভালে রে করিলু, ছাওয়াক মারিলু ক্যানে,
ছুয়া-বারুন নাগইম আজি তোর সাঙ্‌নার কপালে॥
নিন্ হাতে ডাকে তুলিয়া পন্তা খোয়ানু তোকে
কোলার ছাওয়া মোর কান্দিয়া আকুল ঐনা প্যাটের ভোকে॥
রাইতোত এ্যালা তামাসা দেখিম বিছিনাত থাকিতে
নিত্যি পূজার ঠাকুর আজি তোর থাকিবে উপাসে॥

এই ভাওয়াইয়ায় আগের পক্ষের অর্থাৎ পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তান নিয়ে এক নারী সাঙনার (পরের স্বামী) কাছে এসেছে বা বিয়ে করেছে ভাতের জন্য। প্রেম বা অন্য কিছুর জন্য নয়। এখানে দারিদ্র্য রয়েছে, তাই সামান্য পরিমাণ পান্তা ভাত প্রথম পক্ষের সন্তানকে না দিয়ে সাঙনাকে দিয়েছে খাওয়ার জন্য। কিন্তু অকৃতজ্ঞ স্বামী (সাঙ্‌না) তার এই কর্তব্যজ্ঞানকে গুরুত্ব না দিয়ে সামান্য কারণেই তার সন্তান ও তাকে মেরেছে। কিন্তু সেও সহজে ছেড়ে দেবে না। সাঙনাকে ঝাঁটা পেটা করবে। শুধু তই নয়-তার কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ সে তার শয্যাসঙ্গী হবে না। সরল ও সাবলীল ভাষায় সমাজ ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিকের এত সুন্দর প্রকাশ খুব কম গানেই আছে।

ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : প্রচলিত

ওফি ও সাঙ্না মারিলু ক্যানে
ভাতের দুঃখে ওরে সাঙনা, কাইনোত বসিনু মুই
কোন দোষেতে দুয়ার বান্দিয়া মালু আজি তুঁই
সাঙ্না মারিলু ক্যানে॥

পূবের ঘরে মারিতে মারিতে আন্দোন ঘরোত আনিলূ
ভাত আন্দা হাড়ি-পাতিল ন্যাদেয়া ভাঙ্গিলু
সাঙ্না মারিলু ক্যানে॥

মোক মারিলু ভালে রে কলি, ছাওয়াক মারিলু ক্যানে,
ছুয়া-বারুন নাগাইম আজি তোর সাঙ্নার কপালে॥
নিন্ হাতে ডাকে তুলিয়া পন্তা খোয়ানু তোকে
কোলার ছাওয়া মোর কান্দিয়া আকুল ঐনা প্যাটের ভোকে
সাঙ্না মারিলু ক্যানে॥

রাইতোত এ্যালা তামাসা দেখিম বিছিনাত থাকিতে
নিত্যি পূজার ঠাকুর আজি তোর থাকিবে উপাসে।
সাঙ্না মারিলু ক্যানে॥

এ গানটি আবা মধুপর্ণী কোচবিহার জেলার সংখ্যা পৃষ্ঠা নং ৩৬৪ এ দেখা যায়, ওকি স্থানে ওফি বসিয়ে গানটি লেখা হয়েছে। গানের অন্যান্য কথা ঠিকই আছে।

ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : প্রচলিত

মোক মারিলু ভালেরে করিলু, ছাওয়াক মারিলু খাইতে
আটো করিয়া বিছিনারে পড়িয়া
পাঁও ধরাইম তোক আইতে রে সাঙ্না মারিলু ক্যানে।
মারিতে মারিতেরে সাঙ্না পিটিত ফ্যালারুরে কুজ
আশ পড়শি সগাই কয় ও
কাইনের মজা বুজ ওরে সাঙ্না মারিলু ক্যানে॥
আন্দোন ঘরোত মারিলুরে সাঙ্না

বড় ঘরটাও নড়ে ঘরের পাছোত মালদাই আম
ধ্যারধারেয়া পড়ে রে সাঙ্না মারিলু ক্যানে॥

ঐ গানটি আবার বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যভাবেও গাওয়া হয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে সৃষ্ট সময়ের গান আর আজকের গানের মধ্যে অনেক পার্থক্য তা এ গানটিতে লক্ষ করা যায়। গানটি হয়তোবা মুখে মুখে এভাবে এসেছে বা আমরা পেয়েছি। গানের কথা পরিবর্তন হলেও নারী মনের আকুতি ঠিকই আছে। সে যেমন গানে বলেছে রাতের বেলা বিছানা ছোট করে তার সাঙ্নাকে না শোয়ার আগাম ভীতি বুঝিয়েছে। সমাজে মেয়েদের উপর পুরুষের অত্যাচারের কথা এ ভাওয়াইয়াই লক্ষ্য করা যায়।

ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : কেদার চক্রবর্তী

কালা আর না বাজান বাঁশরী,
কালা আর না বাজান বাঁশরী
সাধের ঘরে কালা রইতে না পারি॥
কালারে--
কুল গেল কলঙ্ক রইল
তবু কালা তুই মোর গলার কাটি
ওরে সকাল বৈকাল কালা না বাজান বাঁশী॥
কালারে---
ওরে তোর কালার বাশী সুরে
ওরে নারীর মনে মোর না রয় ঘরে
ওরে কেনরে কালা, বাজান বাঁশী সাঁঝে সকালে॥
কালারে---
আমি না যাবো যমুনার জলে,
না শুনিবো তোমার বাঁশীর গান
ওরে ফুল ফুটিলে, যেমন ভ্রমর
আইসে গুণ গুন সুরে করে মধু পান॥

নারী পুরুষের চিরন্তন ভালোবাসার সহজ সরল অভিব্যক্তি শ্রী কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার বিরহ যন্ত্রণা এই ধরনের ভাওয়াইয়া গানগুলোতে মানুষী প্রেমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : প্রচলিত
শিল্পী : আব্বাস উদ্দিন

কিসের মোর রান্ধন, কিসের মোর বাড়ন, কিসের মোর হলদি বাটা
মোর প্রাণনাথ, অন্যের বাড়ি যায় মোরে আঙ্গিনা দিয়া ঘাটা
ও প্রাণ সজনী, কার সঙ্গে কব দুস্কের কথা।
আর যদি দেখোঙ, আর যদি শোনোঙ, অন্য জনের সঙ্গ কথা,
এহেন যৈবনো, সাগরে ভাসাবো, পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা
ও প্রাণ সজনী কার সঙ্গে কবো কথা॥
মোর বন্ধু গান গায়, মাথা তুলি না চায়, মুঁই নারী যাঁও জলের ঘাটে,
থমকে থমকে হাটোঙ চোখ ইসারা করোঙ, তবু বন্ধু না দেখে মোরে
ওকি হায়রে বন্ধু, পাগল হইতে পারে॥
নিদের আলিসে হাত পড়ে বালিশে মনে করোঙ বন্ধু বুঝি আছে,
চ্যাতোন হয়া দেখোঙ বন্ধু নাই বগলে বুকখান মোর ছেং ছেংগা হইচে,
প্রাণ সজনী কার সঙ্গে কঁও দুস্কের কথা
প্রাণ সজনী বালিসোক ও কঁও দুস্কের কথা॥

এই ভাওয়াইয়া গ্রামের সহজ সরল নারী মনের বিশেষ প্রেমের কথা বলা হয়েছে। আবার কোচবিহারে ইতিহাস (পৃষ্ঠা নং ৪৬) দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রেম, মানুষী প্রেমের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এই ভাওয়াইয়ার রূপকে ভক্ত ভগবানকে নিবেদন করতেছে যে, সে আর সংসারে থাকতে পারছে না। শ্রী কৃষ্ণের আকর্ষণ তাকে সংসার ত্যাগী করতে চলেছে।

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

তুই ক্যানে ডাকিলু নিশা
রাইতে রে মুরুগা তুই ক্যানে
তুই মুরুগা ডাকিয়া
বন্ধু গেইল মোর ছাড়িয়েরে
আইত পোয়াইলে গলাত দেইম
তোক ছুরিরে মুরুগা তুই ক্যানে॥

ডাকিলুতো ডাকিলু কোলার ছাওয়াক জাগলুরে
আইত পোয়াইলে গলাত দেইম
তোক ছুরিরে মুরুগা তুই ক্যানে॥
ডাকিলুতো ডাকিলু নিন্দের ছাওয়া জাগলু রে
আইত পোয়াইলে গলাত দেইম
তোক ছুরিরে মরুগা তুই ক্যানে॥

উল্লেখিত গানটি লেখক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করেছে আজ থেকে ৩৭ (সাইত্রিশ) বছর আগে। কুড়িগ্রাম জেলার পলাশবাড়ি (হরিকেশ গ্রাম থেকে গানটি সরবরাহ করেছেন মরহুম "গোংড়া দোয়ারী"। তিনি কিশোর বয়সে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি জীবিত থাকাকালীন সময়ে বলেছেন এ গানটির বয়স কমপক্ষে ২০০ (দুইশত) বছরের উপর। অবশ্য এ গানটি গীতিকার ও শিল্পী মরহুম কছিমুদ্দিনের নামে বাংলাদেশের বেতার রংপুর কেন্দ্রে প্রচারিত হয়।

ভাষা আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারির উপর ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া

(১)

রচনা : শামসুদ্দীন আহমেদ

সুর : আলতাফ মাহমুদ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙ্গালি
তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি॥
বাঙ্গালি--- মাও কান্দে, বাপও কান্দে, কান্দে জোড়ের ভাই
বন্ধু বান্ধব কাইন্দা কয় হায়রে
খেলার সাথী নাই রে বাঙ্গালি॥
বাঙ্গালী--- ইংরেজ যুগে হাটুর নিচে, চালাইতো গুলি
স্বাধীন দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে
উড়ায় মাথার খুলি রে বাঙ্গালি॥
বাঙ্গালী--- গুলি খাইয়া ছাত্রদের লাশ কবরও না দেয়
সেই লাশের উপর পেট্রোল দিয়া
আগুনে পোড়ায় রে বাঙ্গালী॥

ভাওয়াইয়া

(২)

রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট

সুর : অনন্ত কুমার দেব

ও প্রাণের ভাই মোর বরকত ছালাম রে,
এই দিনে তোমরা নাই
আছেন তোমরা অনন্তে হামার,
রক্তে মিশে সবাই॥
নাইরে এ্যালা উর্দু ভাষা, নাইরে খানের দল
এ্যাখোন মায়ের ভাষায় কইরে কথা সেটাই হামার বল
এতো সুখ এ্যালা হামার মনে কিন্তু তোমরা সাথে নাই॥
পথ দেখাইয়া গেলিরে তোরা অকুলে ভাসেয়া

ভাই হারার কি যে জ্বালা, বুঝাইম কি দিয়ে
দুনিয়া জোড়া তোদের মতো নাইরে কোন ভাই॥

ভাওয়াইয়া
(৩)
রচনা ও সুর : কছিমুদ্দীন

প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা রে,
প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা মায়ের মুখের বুলি
এই ভাষাকে নিবার যায়া, ভাই এর বুকে গুলি রে॥

১৯৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি
বাংলা ভাষার দাবিতে ভাই, রক্তের ছড়াছড়ি রে
বাংলা আমার মায়ের ভাষা আমার সকল আশা
এই ভাষাতে সতী পতীর, শেষ ভালোবাসা রে॥

ভাওয়াইয়া
(৪)
রচনা ও সুর : মোঃ নূরুল ইসলাম জাহিদ

ভাষার জন্য ওমরা দিয়া গিইছে জান
এই ভাষাতে কইলে কথা, বাড়বে হামার ভাষার মান॥
এই ভাষাতে লেখি পড়ি, এই ভাষায় ভাব ব্যক্ত করি
এই ভাষাতে কথা কয়া, জুড়াই হামরা হামার মন॥
এই ভাষাতে বাপ, মায় আদর করিয়া কথা কয়
এই ভাষাতে মায় ডাকেয়া ধন্য হয় হামার পরাণ॥
ভাষার জন্য জীবন দিয়া ভাইয়েরা গেইছে ভাষা থুইয়া
এই ভাষারো মানুষ তোমরা ভালো কাজে দ্যাশ গড়ান॥

ভাওয়াইয়া

(৫)

রচনা ও সুর : শ্রী নীল কমল মিশ্র

শুনো বীর বাঙ্গালি ভাই
বাংলার মতো মিঠারে বুলি, কোন ভাষায় নাই॥
বাংলা হামার মায়ের ভাষা, বাংলা হামার প্রাণ
জীবন দিয়া রাখবো হামরা এই ভাষারো মান
এমন শান্তি আরতো নাই॥
বাংলা ভাষার মান রাখিতে একুশে ফেব্রুয়ারি
শহীদ হইলো কত ভাই মোর বলিতে না পারি
তাঁদের সালামো জানাই॥
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার কতো বীর বাঙ্গালি
মায়ের ভাষায় মান রাখিলো বুকের রক্ত ঢালি
ধন্য সেই শহীদ মোর ভাই॥

ভাওয়াইয়া

(৬)

রচনা ও সুর : মোঃ শাহ্ আলম খন্দকার

য়ের মায়ের ভাষার জন্য যারা দিয়া গেইছে প্রাণ
আমরা তাদের স্মৃতির স্মরণে জানাই লাল সালাম
যারা হামাক দিয়া গেল মুখের ঐ না বুলি
তাদের কথা কোনদিন যাইবো না ভাই ভুলি
স্বাধীন দ্যাশোত তাদের তরে গাইবো মধুর গান॥
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি
বাংলা ভাষার জন্যে হইছে কতো মারামারি
যারা জীবন দিয়া রাখি গেইছে বাংলা ভাষার মান॥

প্রাচীন ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করিম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

তোরষা নদী উতাল পাতাল কার বা চলে নাও
সোনা বন্ধুর বাদের মোর কেমন করে গাও রে॥
বন্ধুয়া মোর বাণিজ্যে গেইছে উজানিয়ার দ্যাশো
সেই না দ্যাশে পুরুষ বান্ধা পড়ে নারীর ক্যাশে
নানান জনের নানান কথা শোনোং নাকং রাও রে॥
একনা তারা দুকনারে তারা তারা ঝিলমিল করে
এমন মজার রাতি যায়রে মন না রয় ঘরে রে
মনোত মোর লক্ষ রে কথা, কারবা আগেঁ কঁও॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করিম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

তুই মোরে নিদয়ার কালিয়ারে
ও মোর কালিয়া দয়া নাই তোর প্রাণে রে॥
আঙ্গিনা সামটিয়া ঘরোনা লেপিয়া, ঘরোনা মুছিনু রে
ছ্যাকা না পাড়িয়া কাপড় ধুয়া কাপড়ো শুকানু রে
ও মোর কালিয়া পেন্দাইয়া নাই মোর ঘরে রে॥
ভাতো না চড়েয়া, ভাতো না রান্ধিয়া, ভাতো না বাড়িনু রে
ও মোর কালিয়া খাওয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে॥
সুপারি কাটিয়া, পানো না সাজেয়া, খিলি না বানানু রে
ও মোর কালিয়া কার মুখোত দিম তুলিয়া রে॥
বিছিনা ঝাড়িয়া বিছিনা পাড়িয়া, মশারি টাঙ্গানু রে
ও মোর কালিয়া শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : আবদুল দরীম
সুর : নায়েব আলী টেপু
শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

গাও তোলো গাও তোলে কন্যা হে
কন্যা পেন্দো বিয়ার শাড়ি
এই শাড়ি পিন্দিয়া যাইবেন
তোমার শ্বশুর বাড়ি কন্যা হে॥
গাও তোলো গাও তোলো কন্যাহে
কন্যা পেন্দো নাকের ফুল
পাতা বাহার চরুনি দিয়া
তুলিয়া বান্দো চুল কন্যা হে॥
গাও তোলো গাও তোলো কন্যাহে
কন্যা হস্তে পেন্দো চুড়ি
শ্বশুর বাড়ি যাইবেন তোমরা
যাইবেন স্বপনো পুরি কন্যা হে॥
গাও তোলো গাও তোলো কন্যাহে
কন্যা পায়ে পেন্দো মল
তবক খিলির সোনা দিয়া
হন বোল ঝলো মল্ কন্যা হে॥
গাও তোলো গাও তোলো কন্যাহে
কন্যা মেহেদী পেন্দো হাতে
ধওলার উপরা হলদিয়া রং
মাখো খানেক তাতে কন্যা হে॥
গাও তোলো গাও তোলো কন্যাহে
কন্যা কর্ণে পেন্দো মাকড়ি
এইবার সেনে সোনার কন্যার
ফাটিয়া পুড়ল ছিরি কন্যা হে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করিম
সুর : গ্রাম্য

হাত ধরিয়া কঁও যে কথা
শোন বৈষ্টম বাউদিয়া
(আরো) অল্প বয়সে মোর সোয়ামী
গেইছে মরিয়া॥
ঐ যে অল্প বয়সে মোর সোয়ামী
গেইছে মরিয়া
শোনেক বৈষ্টম বাউদিয়া
তুই মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর
বৈষ্টম বাউদিয়া॥
মোর মতো দুঃখি নারী
ও হায় ত্রিভুবনে নাই
আর সাধন মন্ত্র দীক্ষা দিয়া
সিদ্ধ কর গোঁসাই
শোনেক বৈষ্টমী বাউদিয়া॥
সত্য কত্তিয়া কঁও যে কথা
ও হায় কিসের এ জীবন
আর ভজন বিনে সাধন নাইরে
বলে কোরাণ-পুরাণ
ও শোনেক বৈষ্টমী বাউদিয়া॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করিম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

এলা দিনের গতি ভালো নয়রে
ও মুই কেমনে রে বাঁচিয়া রঁও
ঘরে মোর ভাত নাই পেন্দনে কাপড় নাই ও
এলা মুই শরমে বাঁচোং না রে॥
ওরে কী দিনো দিলেন বিধি ও
বৌ-এর হাতে পৈছা খাড় ও

ও মুই ব্যাচেয়া খাইচোং রে॥
এলা ক্যামন করিয়া বাঁচিয়া রমো ও
বৈশাখে বিতরী হেমতী ভাদোরে ও
ওরে মাঝিয়াত শরিষা কাঁদে
ওরে আধখানোত মোর চলে না রে
ও মুই কেমনে বাঁচিয়া রঁও॥
প্যাটের ভোক মোর প্যাটোত কান্দে রে
ও মুই গগনে পাতোং রে হিয়া
বিধি দ্যাহার ভিতি চায়া দ্যাখ ও
ও মোর বাতিই বুঝি নেভে রে
ও মুই কেমন বাঁচিয়া রও॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : আব্দুল করিম
সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

প্রেম জানে না রসিক কালা চাঁদ
আই মোর ঝুরিয়া থাকে মন
কত দিনে বন্ধুর সনে হব দরিশন বন্ধু হে॥
ও বন্ধুরে--- নদী ওপাড়ে তোমার বাড়ি,
যাওয়া আইসায় অনেক দেরী
যাব কি রবো কি সদাই করি মানা
হাঁটিয়া যাইতে নদীর পানি
থাকলাঁউ কি খুকলুং কি খাল্লাউ খাল্লাউ করে রে
হায় হায় প্রাণের বন্ধু রে॥
ও বন্ধুরে--- একলা ঘরে শুইয়া থাকোং পালঙ্গ উপরে
মন মোর আবিল বিল বিল করে
করোৎ ফিরতে মরার পালং
ক্যাররোৎ কি কোররোৎ কাড়াউ কাড়াউ করে রে
হায় হায় প্রাণের বন্ধু রে॥
ও বন্ধুরে--- তোমার আশায় বসিয়া থাকোং বট বৃক্ষের তলে
মন মোর উড়াঁও উড়াঁও করে
ভাদোর মাসি দেওয়ার ঝড়ি
টাপপাস কি টুপপুস কি ঝমঝমেয়া পড়ে রে
হায় হায় প্রাণের বন্ধু রে॥

(তথ্য সূত্র : আব্বাস উদ্দিনের গান, পৃষ্ঠা নং-১১৬)

ভাওয়াইয়া

রচনা : তুলসী লাহিড়ী

সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

কি মোর এ জঞ্জাল হইলো রে
কদম তলার ঘাটে
কি খেলে দেখিনু তোরে
হলাম পাগল বিয়া করিবারে॥
ওরে দুই বিঘা ভুঁই বেচিয়া দিনু
টাকা কিপটা বাপ তোর নিলো না রে
রাঁধা ভাতের আশে আনিলাম
তোরে টাকা দিয়া তুলে॥
এখন হাঁড়ি ফেলে হাঁড়ির হাল মোর
হায় হায় হাসে লোকে শুনে
চাঁদ পানা মুখ দেইখে চাঁদির
পৈচা দিনু কিনে॥
সেই মুখের ছাঁঝে থাকতে নারী
কাঁদে রাতে দিনে
হইল হাড় কালি আর মাস কালি মোর
কালো হলো মুখ ও তুই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া দিলি
বিয়ে করার সুখটা রে॥

ভাওয়াইয়া

রচনা : আব্দুল করীম

সুর ও শিল্পী : আব্বাস উদ্দীন

ওরে বাবার দেশের ওরে কুড়ুয়া
আজি ক্যানে কান্দেন তোমরা চন্দন বৃক্ষের ডালে রে॥
ওরে ফানুসিয়া পংখী তুই
চিতুল বিদুয়া মুই রে
আজি কিবা খবর কইও রে আমার আগে
ওরে লোহা দিয়া বাঁধিনু ঘর
মুখের কথায় তোমার না সইল ভর রে॥

সেও ঘর মোর ভাঙ্গিয়া রে নিলো ঝড়ে
ওরে যৈবনেতে কাঁদো মাখি একেলা পালংকে থাকি রে
বালিশ ভেজে মোর চপো রাইতে কান্দি
কুড়ুয়া পাঁও ধরোং তোরে, কুড়ুয়া মাথা খান মোরে
কুড়ুয়া দোহাই তোমারে॥
আজি উড়ান উড়ান কুড়ুয়া উড়ান ওরে
ওরে আকাশেতে পাংখা মেলি
বাবার দ্যাশে তোমরা যান চলি রে
মুই নারীটা চায়া রে থাকিম দূরে
বাবার কাছে যাইয়া কইবেন তোমরা
আগুন জ্বলে তোমার বেটির কপালে॥

(তথ্য সূত্র : আব্বাস উদ্দিনের গান, পৃষ্ঠা নং-১১৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

প্রথম অঘ্রাণ মানে নয়া হেউতি ধান
কেউ কাটে কেউ মাড়ে কেউ বরে নবান
যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায়,
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখে চায়॥
এই মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ
লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস
পৌষ না মাসেতে কন্যা লোক খায় আলোয়া
ভালো ফুল ফুটিয়াছে কেকেটি কমলা
কেকেটি কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী
তরুণ বয়সের বেলা ছাড়িল সোয়ামী॥

(হেউতি– আমন, নয়া-নতুন, আঁধে-রান্না করে, পরার মুখে-অন্যের মুখে)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

প্রাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্ধুরে।
মৈষ চড়ান মৈষাল বন্ধু ঘাটের উজানে॥
তোমার মৈষের ঘন্টির বাইজে মন উড়াং বাইড়াং করে রে
মৈষ বান্ধা মৈষাল বন্ধু বাড়ির বগলেতে
মুই নারীটা দেখা দিম কালে বৈকালে রে
ভার বান্ধেন ভাড়াটি বান্ধেন
মৈষাল ছাড়িয়া আপন ময়া
ওরে আজি কেনে দেখং মৈষাল,
কান্দি কান্দি ঝড়ি রে॥

(ঘন্টি-মইষের গলার ঘুঙ্গুর, বাইজে-বাজনায়, বগলেতে-পাশে, দেখাদিম- দেখাদিব, ময়া-মায়া, দেখং- দেখি)

ভাওয়াইয়া (চকটা)
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই, আমাক না মারিও
কাল দাড়িকার হবে বিয়াও রে
আমি ঘটক হয়া যাইম
ও মোর কৈকৈমাসী মেনকা দিদি খেমক ঢিলা জটা বগিলা
শালুক শালুক শালুক ননদীয়া কিমা ঐ না মোর কে,
কাইল দাড়িকার হবে বিয়াও রে আউজো চান্দো না আইল রে॥
ট্যাপামাছে বলে মাঝি ভাই আমাক, না মারিও
কাল দাড়িকার হবে বিয়াও রে
আমি সারিন্দা বাজাইমও মোর কৈকৈমাসী মেনকা দিদি
খেমক ঢিলা জটা বগিলা
শালুক শালুক শালুক ননদীয়া, কি মা ঐ না মোর কে
কাইল দাড়িকার হবে বিয়াও রে, আইজো চান্দা না আইল রে

পুটিমাছ বলে মাঝি ভাই আমাক না মারিও
কাল দাড়িকার হবে বিয়াও রে॥
আমি হাউস করিয়া যাইম, ও মোর কেকৈমাসী মেনকা দিদি
খেমক ঢিলা জটা বগিলা
শালুক শালুক শালুক ননদীয়া, কি মা ঐ না মোর কে,
কাইল দাড়িকার হবে বিয়াও রে আইজো চান্দা না আইল রে॥

(যাইম-যাব, চান্দা-চান্দা মাছ)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও কি নাগর কানাই তুই মোরে
উজান ছাড়ি ভাটির দ্যাশেত কল্লেন মায়া বাড়ি
ওরে যৈবন কালে দোনো জনায় হলং ছাড়াছাড়ি রে॥
তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
নাগর অনেক দূরের ঘাটা
ওরে ক্যামন করি হইবে দেখা
ঝরে চোখের পানি রে॥
ভোমরা খালি উইড়া পড়ে
নাগর ফুলের মধু বান্দে
ওরে তাই ভোমরার বাদে আসি
মোর পরাণ কান্দে রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

নাইয়া রে চাপাও নৌকা কমলা সুন্দরীর ঘাটে রে॥
নাও বায়া যাও নাইয়া রে
তোর সে মনের সুখ,
ওরে নায়ের বাদাম তুলিয়া নাইয়ারে
আরে দেখাও চান্দ মুখ রে॥

মনে বড় দুখ নাইয়ারে চিত্তে বড় দুখ
ওরে নদীর পাথারে মতো আরে, ভাঙ্গে নারীর বুক রে॥
নদীর মাঝে থাক নাইয়া রে, নায়ের কাণ্ডারী
ওরে অভাগিনী নারীর নাইরে নাইয়া যৈবনের ব্যাপারী রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

অ মোর তনের বন্ধুরে, অ মোর মনের বন্ধুরে
অ মোর প্রাণের বন্ধুরে
মোক ছাড়ি নিদয়ার বন্ধু, কোন্টে গেইলি রে॥

না পুরিল আশ রে বন্ধু না পুরিল আশ
দিন ঘুরিল আতি ঘুরিল, ঘুরিল বয়স মাস॥
আসমানেতে তারা জ্বলে, মনোত জ্বলে আগুন
সে আগুন অরে বন্ধু নিভাইবার নাই।
কোন্টে গেইলি কোন্টে রইলি মোক ছাড়িলু তুই॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

তিস্তা নদীর পারে পারে ও মোর বাই গে
না জানি মৈষাল বন্ধু মোর ভইষ চড়েবার আইসে॥
আজি খড়ি কাটিয়া দে, রে মৈষাল বোঝা বান্দিবার দে
হাত ধরোঁ মিনতি করোঁ রে মৈষাল মাথাৎ তুলিয়া দে॥
হাত ধরোঁ মিনতি করোঁ রে মৈঁষাল আজি আগ বাড়েয়া দে॥
আগ বাড়েয়া দে রে মৈষাল বাড়িত পরুছেয়া দে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও কি তুই মোর নিদারুণ মোর কালিয়া রে
লজ্জা নাহিরে ওরে কানাই লজ্জা নাইরে তোরে রে॥
ওরে কাপড় চুরি করিয়া গাছোত
তুলিয়া রাখালু ক্যানে রে
হাত ধরোং তোরে কানাই পাঁও বা ধরঙ তোরে
ওরে গাছের কাপড় পারিয়া দে
মুই যাও এলা ঘর রে॥

একেতো শীতের দিন তাতে আছোঙ জলে
ওরে এতো কষ্ট দেখিয়ারে তোর দয়া নাই মনে রে॥
দেরি ক্যানে করিস কানাই মানষি বুঝি আইসে
ওরে এতো রঙ্গ দেখিয়ারে কি, তোর আশা নাই মেটে রে॥
হাতের বাঁশী ফেলিয়ারে কানাই কাপড় পাড়িয়া দে
ওরে ডাঙ্গায় উঠি কাপড় পিন্ধি যাইম মুই নিজের ঘরে রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও কি কানাইরে– কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে
অসুখ সিমিলার নাও বৈঠায় না ধরে ভাও রে
ও হো হো কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥

যে নাইয়ায় করিবে পার কানাইরে
তাক দিব আমি গলার হার রে তাক দিব আমি চন্দ্রা হার রে॥
ও হো পার হইলে মুই নারী তোমার রে
ও হো হো কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥
এলুয়া কাশিয়ার ফুল নদী হইল কানাই হুলস্থুলু রে
ওরে কানাইরে পার হইলে করিব যৈবন দান রে
ও হো হো কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

আমি মরিব রে দরিয়ায় ঝম্প দিয়া
প্রাণ বধিব গলায় কাটারি দিয়া
কাগায় করে মোর জড়ায়ে জড়ি
চিতুল বয়সের বিধি করিলেন আড়ি॥
আরে ও পরাণের নাথ
আজি ক্যানে দ্যাখোঙ নাথ বিষের মতো॥
আরে ও দারুন বিধাতার বিধাতা
হাউস না মিটিল নারীর পিন্দিয়া শাখা॥
আরে ও মোরে বাঞ্জা ওরে দাদা
সুখের সময় বিধি ভাঙ্গিলেন ওরে জোড়া॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও শ্যাম চিকন কালা
ধুইলেন কি মনের কালি উঠে
ধোয়া কাপড়ে লাগাইলে কালি
যে বা ধোপায় ধুইতে পারে রে॥
তোমরা যাহবেন দূরদেশে
সদাই মনে মোর ঝুরি থাকে রে,
বালিস ভেজে মোর দুই নয়নের জলে রে
ধুইলেল কি মনের কালি উঠে রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

আজি গাও তোলো গাও তোলে ও মইষাল বন্ধুরে
গাও তোলো গাও তোলো বন্ধু গাও তোলে ডাংগিয়া
কি ও হোরে কোন বা চোরা
নিয়া যায় মোক চুরি না করিয়া রে॥
মইষ চরাণ মোর মইষাল বন্ধু মইষের গলায় দড়ি
কি ও হোরে বিধাতা বঞ্চিত হইল
মোরে একলায় যাইবেন ছাড়ি রে॥
মইষ চরাণ মোর মইষাল বন্ধু বড় বাসের খোপে
কি ও হোরে কোন বিধি নিদারুণ হইলে
দংশিল কাল সাপে রে॥
ওঝায় ঝাড়ে বৈদ্যে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
কি ও হোরে মুই অভাগী ঝাড়োঙ বন্ধুক
ক্যাশের আগাল দিয়া রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও দ্যাওয়া বাও তোলাও রে
ওরে বাছা যাদুমণি, নৌকা ঠেকিল বালুচরে
উত্তরে করিছে ম্যাঘে ম্যাঘালী
দক্ষিণে ঝেলেকে দ্যাওয়া॥
পূর্ব না হইতে আইসে এ দ্যাওয়ার ঝরি
ভিজিয়া মইল পরাণ ব্যাটা
ভিজিয়া মৈল শীতিয়া মৈল
কাইনচা চাপিয়া প্রাণনাথ বৈস॥
ব্যাড়ার ঝেলেক এ চাকু দ্যাও ফ্যালে,
মোকে কাটিয়া ঘরে আইস
পশ্চিম সাজিল ম্যাঘে ম্যাঘী
পূর্বে সাজিল কালি
আংগুল কাটিয়া চণ্ডীকে পূজিব
তাও যাব শ্যাম বন্ধুয়ার বাড়ি॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ওরে ও মোর চাঁদ ওরে সোনা
সুখের সময় তোমরা ছাড়িলেন ক্যানে বন্ধুরে৷৷
ওরে হইলেন বন্ধু ছাড়াড়ি
ক্যানে নিলেন প্রাণ কাড়ি রে৷৷
ভাওয়াইয়াই গানের সুরে রে
ছবি তোমার মনে জাগে রে৷৷

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও নাগার কানাইয়ারে
আজি দরিয়াতে নাই মৎসরে
ওহো হে নাগর কানাই বগিলা ক্যানে পড়ে
তোর সঙ্গে নাই মোর পীরিতি
মনটা ক্যানে মোর ঝোরে রে নাগর কানাইয়ারে৷৷
ঘোড়াশালে ঘুড়ী বন্দি রে
ওহো রে নাগর কানাই মৎস বন্দী জলে
পুরুষ ভোমরা জাতি, বন্দি নারীর কোলে রে
নাগর কানাইয়া রে৷৷
গাছের মধ্যে বট বৃক্ষ রে
ওহো রে নাগর কানাই বাড়িয়া যায় লতা
আমি তো নাই ভাঙ্গী রে পীরিতি
ভাঙ্গিছে বিধাতা রে
নাগর কানাইয়া রে৷৷
বাপক নাই কঁও লাজে কানাই রে
ওহো রে কানাই ভাইওক না কঁও ডরে
সুরু সুতার ভিজা বস্ত্র যৈবন
হালিয়া পড়ে রে
নাগর কানাইয়া রে৷৷

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

(ওরে) নদীর পাড়ের কুরুয়া রে মোর
জামের গাছের সুয়া
(আজি) ক্যানে কান্দেন অমন করি
চোক্ষের জল ফ্যালেয়া রে
কোরা রে মুইও কান্দং চিটুল বিদুয়া হয়া॥
ঢাল কাউয়াটার কান্দন শুনি
মনের আগুন জ্বলে, পতি যে মোর গেইচে মরি
আদর নাই মোর ঘরে ঘরে রে
কোরা রে মুইও কান্দং চিটুল বিদুয়া হয়া॥
(ওরে) জলে কান্দে জল কোরা রে কুরির লাগিয়া
মুই অভাগী কান্দং বসি পতিকে হারেয়া রে
কোরা রে মুইও কান্দং চিটুল বিদুয়া হয়া॥
(ওরে) না মিটিল মনের আশা ভাঙ্গিল যে মনের বাসা
ভরা যৈবন কেমনে চাপিম, পতিকে ছাড়িয়া রে
পতি মোর কোট গেইছে অভাগীক ফ্যালেয়া॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

ও পতিধন আইস আইস হে পতিধন বৈস॥
শ্যাওড়া গাছে যেমন ঘুঘুরে বাসা
দূরের বন্ধু মোর কিসের আশা হে
পতিধন আইস॥
মেঘের তলে যেমন রে ছায়া
দূরের বন্ধু মোর মতন মায়া হে
পতিধন আইস॥
ধরলা পারে যেমন ধূ ধূ রে বালা
সেই মতো প্রাণে মোর বিষম জ্বালা হে

পতিধন আইস॥
তোরষার পারে যেমন চিটকারে মাটি
সেই মতো ভোমরারে মোর গালার কাটি হে
পতিধন আইস॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

পবন আমি নারী ভাসিলাম গঙ্গার জলে,
পবন রে॥
আর জলে যেমন ফ্যানা ভাসে
ও হো হো পবন-জলে মিশে পবন রে॥
আর দরিয়াত কুটা ভাসে
ও হো হো পবন সেও একদিন কিনারে
চাপে পবন রে॥
যৈবন হাসে আর আশে
ও হো হো পবন সেও রইল
পরবাসে পবন রে॥
পবন যদি আপন হইত
ও হো হো পবন দিনের খবর দ্রিনে
বলত পবন রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : গ্রাম্য

মোর সোনা ছাড়িয়া ওরে গেইচে
বন্ধু হে আগ দুয়ারে রুইয়ারে কলা
বকদুলে চুসিয়া খাইবে রে
বন্ধু হে চোচার ভাগী হইবেন তোমরা রে॥
ওরে দাঁত কাটিয়া দিতেন ওরে গুয়া
বন্ধুহে মুখে তুলিয়া খাব
তোমার মতন আর সোনার বন্ধুরে

বন্ধু মইলে আর কোথায় পাব রে॥
হাউদা দেখিয়া হস্তী ওরে কান্দে
বন্ধুহে ঘোড়া কান্দেরে ঘোড়াশালে
মোর অভাগীর মন কান্দেরে
বন্ধুহে ঐ নিধুয়া পাথারে॥

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (১)
রচনা : আব্দুল করীম
সুর : আব্বাস উদ্দীন

মহিলা : বেদিয়া সোনার চাঁদ
মাটিতে পাতিল ফাঁদ হয়
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি হাওয়ায় ওড়ে॥
পুরুষ : আশে পাশে আহার করে
পূবাল হাওয়ায় পাংখা নড়ে
বেদিয়ার ফাঁদ পাতায় নড়ে চড়ে॥
দ্বৈত : ফাঁদে পংখী পড়িয়াও না পড়ে॥
মহিলা : তুই বন্ধুর ফাঁদে পড়ি
রঙ্গের অঞ্চল ধরি হায়
মোর বন্ধু রাঙ্গিয়া রাঙ্গিয়া ওঠে
দেখি বন্ধুর কিবা শোভা
মনের হাইসে বান্ধিনু খোঁপা॥
দ্বৈত : মনের ফুল মোর ফোটে ফোটে ফোটে॥
পুরুষ : ফুটিয়া উঠিল ডাকি
ফাঁদে পড়িল থাকি থাকি
হলুদিয়া কন্যার হলুদ পাখি
ওরে তোর চোখে চোখে রাখি
হলুদিয়া কন্যার হলুদ পাখি
ওরে তোর চোখে চোখ রাখি
মুখ দেখি মন দেখি
ফুলের উপুরা ভোমরা হয়া জাগে॥
দ্বৈত : আহারে মনের আশা
দোনোজনে বাঁধি বাসা
কিসের মজার দক্ষিণা হাওয়ায় ভাসি

গান কয়া ভুরা বাঁধি
চলি যামো নদী নদী
চলি যামো নদীর ভাটি ভাটি॥

(আবাস উদ্দীনের গান। পৃষ্ঠা নং ১২১)

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (২)
রচনা : আব্দুল করীম
সুর : আব্বাস উদ্দীন

পুরুষ : যামো যামো যামো কন্যা হে
কন্যা যামো আজি চলি
যাবার সময় কওরে তুমি
মনের কথা খুলি কন্যা হে॥
মহিলা : ও মুই কান্দিনু কাটিনু তুই বন্ধুয়ার বাদে রে
ও মোক ছাড়িয়া না যান রে
দিনু কি না দিনু মোর পরাণ
ছাড়িয়া যাবার চান মোরে॥
পুরুষ : ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো কন্যা হে
কন্যা মিছাই তোমার মায়া
দিনের বেলা ভাটি গেইলে
দিনোৎ পড়ে ছায়া কন্যা হে
ওরে তোর চোখে চোখে রাখিহে॥
মহিলা : ও মুই মালা বা গাঁথিনু
তুই বন্ধুয়ার বাদে রে
ও মোক ছাড়িয়া না যান রে
পিরীতের সুতাতে এ মালা গাঁথিচোং
বদল করিয়া নেও মোরে
মালা ফেরৎ না দেন মোরে রে॥
পুরুষ : বদল বদল করেন কন্যা হে
কন্যা বদলের নাই দায়
ফুলের যৌবন শুকিয়া গেইলে
ভোমরা উড়িয়া যায় কন্যা হে
মহিলা : ও মুই বুঝনু বুঝনু তুই বন্ধুয়ার মনটারে

ও মোক ছাড়িয়া যাইবন রে
কনু কি না কনুরে বন্ধু
সঙ্গে করিয়া নেও মোরে॥
পুরুষ : দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কন্যা হে
কন্যা আমার মায়া ছাড়ো
বনের পংখী বনে গেইলে
আইসে নাকি আরো কন্যা হে॥

(আব্বাস উদ্দীনের গান। পৃষ্ঠা নং ১২২)

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৩)
রচনা : আব্দুল করীম
সুর : আব্বাস উদ্দীন

পুরুষ : ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল
তিন কন্যা জলোৎ যায়
কারবা কেমন গুণ কন্যা হে
ওরে আগের জনা তেমন হে
ও কন্যা পিছের জনা ওরে মন্দ
মধ্যের জনকার কেশী খাটো
আগের জনাই ভালো কন্যা হে॥
মহিলা : কোন দুলাইরা ঘরো বন্দু হে
বন্ধু কিসের ব্যাপারে করো
সত্য করিয়া কওহে বন্ধু
বিয়াও নাহি করো বন্ধু হে॥
পুরুষ : উজান দ্যাশে ঘরো কন্যা হে
ও কন্যা ভাটি ব্যাপার করো করি
সত্য করিয়া কইলাম কন্যা
বিয়াও নাহি করি কন্যা হে।
বলদ নঁড়াও, বলদ চঁড়াও হে
কন্যা বলদোক মারোং ওরে কোড়া
বলদের পৃষ্ঠে তুলিয়া দিচোং
সারিন্দা দোতরা কন্যা হে॥
মহিলা : তালের মতো গুয়া বন্ধু হে

বন্ধু কলার মতো পান
বাটা ভরা সুপারি আছে
আমার বাড়ি যান বন্ধু হে॥
পুরুষ : কোন দুয়াইরা ঘরো কন্যা হে
ও কন্যা কুনদি তোমার ঘাটা
সত্য করিয়া কও হে কন্যা
কোনটে হমো দ্যাখ্যা কন্যা হে॥
মহিলা : পূর্ব দুয়াইরা ঘরো বন্ধু হে
ও বন্ধু পশ্চিম দিয়া ঘাটা
সত্য করিয়া কইলাম বন্ধু
বাড়িতে হমো দ্যাখা বন্ধু হে॥

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৪)
রচনা : আব্দুল করীম
সুর : আব্বাস উদ্দীন

মহিলা : দ্যাওয়ায় করছে মেঘ মেঘালি তোলাইল পূবাল বাও
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরী হে
ও তুমি ধীরে ক্যানে বাও॥
হাড়িয়া মেঘা কুড়িয়া মেঘা আড়িয়া মেঘার নাতি
গিসসি আইসে দ্যাওয়ার ঝরি হে
ও দ্যাওয়া তোলাইল পূবাল বাও
ধীরে ধীরে বাওয়াও তরী হে॥
পুরুষ : হাঙ্গর কুমির বন্ধু আমার নদীক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হবো পার ও কন্যা নদীক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হবো পার॥
কালা শাড়ি পেন্দনে চাঁদ তোর ভোগধান বাসায় গাও
শোনেক শোনেক সোনার কন্যা হে, ও কন্যা নাওয়ে দিছেন পাও
এখন তুমি কিসের বা ভয় পাও॥
মহিলা : তুমি তো সুজনওরে নাইয়া আমার কথা শোনো
শিমুল কাঠের নৌকার তোমার হে।
পুরুষ : শিমুলও নয়, সেগুনও নয় মন পবনের নাও
সাতসমুদ্দুর পাড়ি দেবো হে-কন্যা যদি সাথে রও
ভয় না করি তিস্তা নদীর ঝড়।
ওরে গগন কালা, শাড়ি কালা, কালা পানির ঢেউ

কালায় কালায় কালা হইল রে
ও কন্যা আমার ভাটির নাও
ধীরে চলো সোনার নৌকা হে॥
মহিলা : শোনেক নাইয়া ভাটির নাইয়া বলি তোমার আগে
তুমি আমার প্রাণের কালা হে
ও বন্ধু কালায় কালাক্ দ্যাখোং
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু হে॥
দ্বৈত : ভাটির নাও মোর ভাটি চল নাওয়ে সোনার ধন
ধীরে চল ধীরে চল হে
ও নৌকা তীরে আমার ঘর
ধীরে চল সোনার নৌকা হে॥

(আব্বাস উদ্দীনের গান। পৃষ্ঠা নং ১২৩)

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৫)
রচনা : আব্দুল করীম
সুর : আব্বাস উদ্দীন

পুরুষ : আইল্ বাঁধো কন্যা জলোরে ছ্যাকো
সুন্দর গায়ে কন্যা কাঁদো মাখো
আজি চউখ তুলি দ্যাখো আমার আগে হে
হলদি গায়ে কন্যা কাদোরে হাসো
আইল্ বাঁধো কন্যা কিসের আশে
আজি কথা কও হে কন্যা বৈদেশিয়ার আগে হে॥
মহিলা : চোখের জলো বন্ধু জলোরে পইলো
বাঁধো জলো বন্ধু বেশি হইলো
আজি বাঁধি আইল বন্ধু আটক করিবার আগে হে
টোপে টোপে বন্ধু জলোরে পড়ে
অনেক কথা বন্ধু হৃদ্দের পড়ে
আজি তোমাক দেখি বন্ধু মনের পংখী হাসে রে॥
পুরুষ : বলো বলো কন্যা কিবারে দুঃখ
তোলো একবার কন্যা চান্দো মুখ
আজি নিতে পারি কন্যা কিছু তোমার শোক হে॥
মহিলা : বন্ধুর বাদে বন্ধু কাঁদিরে আমি
সেও বন্ধু মোর হৃদ্দের স্বামী

আজি ভরা যৌবন বন্ধু দ্যাখে অন্য লোক হে॥
পুরুষ : কোন্টে থাকে কন্যা তোমার স্বামী
কোন্টে দ্যাখা তার পাব আমি
আজি কও হে কন্যা তুমি সে কথা আমাকে হে॥
মহিলা : উজান গেইছে বন্ধু বাণিজ্যের আশে
এলাও টারোৎ বন্ধু গামছা হাসে
আজি সকল কথা কইও তাহার আগে হে॥

(আব্বাস উদ্দীনের গান। পৃষ্ঠা নং ১২৪)

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৬)
রচনা : আব্দুল করীম
সুর : আব্বাস উদ্দীন

মহিলা : নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও মোর বন্ধু
বন্ধু নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও
একবার নাইওর গেইলে কালে হে
থুইয়া যাইবে মাও রে (আই মোক)॥
পুরুষ : যেও কথা কইলেন কন্যা হে কন্যা সেও কথা জানি
একবার নাইওর ছাড়িয়া দিয়া পাও ধরিয়া আনি কন্যা হে॥
মহিলা : দাদা আইসছে তোমার বাড়ি হে
বন্ধু নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও
এক নজর দেখিয়া আইসোং
দয়ার বাপো মাও (হে বন্ধু)॥
পুরুষ : যেও কথা কইলেন কন্যা হে কন্যা কথা মন্দ নয়
রিমিঝিমি দ্যাওয়ায় ঝড়ি একলা ঘরে ক্যামনে রওয়া যায়॥
মহিলা : ক্যামন তোমার কথা হে বন্ধু
বন্ধু ক্যামন তোমার হিয়া
শরমে মরিবার চাই হে
গলায় দড়ি দিয়া হে॥
পুরুষ : তুমি ক্যানে মরবেন কন্যা হে কন্যা আমার পরাণ হরি
তুমি হও দরিয়া কন্যা আমি তাতে ডুবি মরি হে॥
মহিলা : আদ্য গুরু পিতা হে মাতা
বন্ধু জনমদাতা বাপে

কাঞ্চা সোনা বুড়ার আশা হে
নইলে মারবে অভিশাপে হে বন্ধু॥
পুরুষ : শোনেক শোনেক শোনেক কন্যা হে
কন্যা হিতকথা কঁও
পূবের বেলা পশ্চিম গেইলে
ছাড়িয়া দিবার নাঁও কন্যা হে॥

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৭)
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

পুরুষ : ওক্‌না কাঁই অবোলা বালা ধল্লা নদীর পাড়ে
কাঞ্চা সোনার মত রূপ জ্বলে॥
মহিলা : ভেলা কোপাত বাড়ি ও মোর ফুলমালা নাম ও মোর ফুলমালা নাম
আশে পাশে সবাই আছে নাই আপন জন॥
পুরুষ : আপন জনও নাইযে তোমার ও কন্যা হমো তোমার সাথী
আরে সত্যি করিয়া কনহে তোমরা, আছে না নাই আপন জন॥
মহিলা : এইটা যদি তোমার কথা বন্ধু আইসেন হামার বাড়ি
আরে বাপও মাওক বুঝিয়া কইবেন ওমরা হয় যদি রাজি বন্ধু হে॥
পুরুষ : মনোত যদি না থাকে তোমার ও কন্যা না যাই তোমার বাড়ি
এই ঘাটোতে না থাকিয়া নৌকা দিমো ছাড়ি কন্যা হে॥
মহিলা : সউগ কথা কি ভাঙ্গিয়া কওয়া যায়, একনা কথা শোন
মনের কথা না বুঝিলে কথা নাই আর কোন বন্ধু হে॥
কনু কি না কনুরে বন্ধু
সঙ্গে করিয়া নেও মোরে॥
পুরুষ : দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কন্যা হে
কন্যা আমার মায়া ছাড়ো
বনের পংখী বনে গেইলে
আইসে নাকি আরো কন্যা হে॥

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৮)
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

মহিলা : না মারেন আর সোনা বন্ধু না জান ফ্যালেয়া
মনের কথা কনরে বন্ধু কানোত পরিয়া॥
পুরুষ : না দেন খোটা প্রাণের কন্যা মনের কথা কন,
তোমরা ছাড়া এই জগতে নাই যে আপন জন॥
মহিলা : ছোট কালে ভাবের কথা কিছুই বোঝং নাই
বয়স কালে ওরে বন্ধু পৈতানোত দিছেন ঠাঁই
ভালো শরিল কালা হইল যে, সেই কথা ভাবিয়া॥
পুরুষ : বয়স কালের কথা কন্যা বয়স কালে মানায়
ঠিকমতো বুঝিয়া তোমরা খুলিয়া মোকে কন॥
মহিলা : ভালো করিয়া কন বন্ধু পাও ধরিয়া কঁও
তোমরায় হামার মনের মানুষ তোমরা হামার জান॥

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (৯)
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

মহিলা : ফ্যালেয়া না যান ও মোর বন্ধুয়া, বন্ধু ছাড়িয়া না যান মোকে
মোর অভাগীর আর কাঁইও নাই, যাইম মুই তোমার সাথে রে বন্ধু॥
পুরুষ : কিবা কথা কইলেন কন্যা হে, কন্যা মনোত নাই মোর সুখ
তোমাক না পাইলে কন্যা পাবো বড় দুখ কন্যা হে॥
মহিলা : আশ পড়শীর চোখের কাটা মুই, ওমোর আপন কেহ নাই
তোমারো পইতানোত এ্যাকনা দিবেন মোকে ঠাই ওরে বন্ধু॥
পুরুষ : ঘর পোড়া গরু যেমন ও তাই সিঁদুর ডরায়
চপো রাইতে নিন্দ ধরেনা, তোমারি আশায় রে কন্যা॥
মহিলা : বকু ফাটে মোর মুখ ফোটেনা, ও মুঁই বোঝাও ক্যামন করি,
তোমাক না পাইলে বন্ধু যাইম মুঁই আজি মরিরে বন্ধু॥
পুরুষ : মনের কথা কনু কন্যা মুই ও কন্যা বোঝেন না আর ভুল
এক বৃন্তে থাইমো ওযে আমরা দু'টি ফুল কন্যা হে॥
উভয়ে : এক বৃন্তে থাইমো ওযে আমরা দু'টি ফুল কন্যা হে
এক বৃন্তে থাইমো ওযে আমরা দু'টি ফুল কন্যা হে॥

দ্বৈত ভাওয়াইয়া (১০)
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : অনন্ত কুমার দেব

পুরুষ : একে ডাংগে হাড্ডি ফাটাইম, মানুষ চিনিস না, ও তুই মানুষ চিনিস না
ওরে দিনে রাইতে ঝগড়া তোমার শরিলে সয়না
ওকি বাপরে বাপ এমরা আচ্ছা ঢোরা সাপ, যায়না কেনে সংসার ভাসিয়া॥
১ম মহিলা : ছোট বউয়ের দুইটা শাড়ি, মোর একটাও জোটে না
মোর মাথাত যে জট পাকাইচে তাকো দেখেন না॥
পুরুষ : হুর এগুলা ক্যামন কথা কয়
এ্যাদোন করলে কয়া দিনু গুজরান এটাই হবার নয়॥
২য় মহিলা : জানি হামরা ও দেওয়ানি কেমন তোমরা মরদ
সারা যাগাত মারবার পান না দেখান আসি ঘরোত॥
পুরুষ : এমরা মোক এ্যালাও চিনলে না, সারা যাগায় মানুষ মানে এই এমরায় মানে না॥
২য় পুরুষ : ও দেওয়ানি মাথাত ক্যানে হাত
এই দুই বিয়া করি তোমার হামভাত আর জম ভাত
একের অধিক বিয়া ভাইরে মোটেই ভালো না
জীবন থাকতে দুইটা বিয়া কাঁইও করেন না॥

তেভাগা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের উপর ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

বিকান থাকি আলুরে কাঁইয়া
হাতে লইয়া ঘটি
আস্তে আস্তে নিলুরে কাঁইয়া
মোদের দেশের মাটিরে
কোন দেশের নাড়িয়া কাঁইয়ারে॥
মোর দেশে আলুরে কাঁইয়া
মোর মাটি নিলু
পেটের ভোকে তে ভাগা চাইতে
মাথাতে ভাংগালুরে॥
কাঁইয়া কান্দে কাঁইয়ানি কান্দে

কান্দে কাঁইয়ার মাও
মণিসেনের মাথায় ডাংগেয়া
কি করিস উপায়রে॥

(গানটি তেভাগা সংগ্রাম ৪০ তম বর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশের কৃষক সমিতি থেকে নেয়া)

মুক্তিযুদ্ধের ভাওয়াইয়া
রচনা ও সুর : কুছিমুদ্দীন

ওকি বাপরে বাপ মুক্তিফৌজ
কি যুদ্ধকারে বাপরে॥
মুক্তি ফৌজের বিচ্চুগুলো
খান মারিয়া করলো সারা
খানেরা হইল দিশাহারা বাপরে॥
কাসিয়া কাটি বানায় জুরি
তাতো নাগে মুক্তি গুলি
খানেরা হইল দিশাহারা বাপরে॥

ছোটদের ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

আমের গাছের আম ধরে
জামের গাছে জাম
কুড়িয়া মানষের ভোকে বেশি
না করে তাঁই কাম॥
কলার গাছে কলা দেখ
ধরে থোকা থোকা
গোসা হয়া ভাত না খায় যাঁই
তাই বড় বোকা॥
গাছোত থাকে নারিকেল ভাই
ভিতরা থাকে পানি
নিজের ভালো সেইটারে ভাই
পাগলা মাইনষেও বোঝে॥

ছোটদের ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

টংয়ের পাড়ের কথা নাই
আগে দিনের মজা নাই
সেই দাদীর মুখে হাসি নাই, দাদুর দীর্ঘশ্বাস
সুখে একদিন ভরা আছিল, হামার সোনার দেশ॥
জঙ্গল ঝাড়ে আগে মতো জোনাক জ্বলে না
মুড়মুড়কির দোকান এখন চোখে পড়ে না
কোকিল নাইরে কদম ডালে একি সর্বনাশ॥
শালিক পাখির জোড়া এখন দেখা যায় না
চিল শকুনের দেখার কথামনে পড়ে না
কাতল চিতল পাঙ্গাস ভেরুশ দেখা যায় না মাছ॥
ডাউক পাখির গানেরে ভাই মন নিতো কাড়িয়া
সারা দেশে ফলতো ফসল সোনার মাঠ জুড়িয়া
নদীর বাঁকে নাইরে এখন সেই বালিহাঁস॥

ছোটদের ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

ও সোনা ব্যাঙ ও হোলা ব্যাঙ
পড়ার সময় ক্যানবারে তুই
করিস ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ॥
মন চায়রে ও সোনা ব্যাঙ
বন্ধু করিম তোকে
করমো খেলা দোনোজনে
ঐ না জলের মাঝে
দোনোজনে এক সাত হয়া করমো নয়া গান॥
হামার বাড়ির বুড়ি দাদীর
তোর উপরা খুব রাগ
তোর মতো দাদীর গলাত
আছে একটা ঘ্যাগ
ঐ কথা কইলে দাদীর বাড়ে খুবই ঢ্যাং॥

ছোটদের ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

ও দাদা তুই অষ্টমী যাবুরে
সাথে নিয়া যারা ও মোক বাতাসা কিনিয়া দে॥
তুইরে হামার বড় দাদা হামার কিসের ভয়
মায়ের প্যাটের ভাইওক নিয়া মানুষ, বাঘ মারিবার যায়
মুড়ি মুড়কি কিনিয়া দিবু আরো বইনের ফিতা রে॥
গুড়ের জিলিপি নেইমও মুই বইনের হাতের চুরি
তালের পাখা কিনিয়া দিবু আরো হাতের ঘড়ি
বাসালী ত্যাল এক বোতলও আরো হাতের বাজু রে॥

ছোটদের ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

ছি ছাত্তা খেলবার মনায় মোক
খেলাত কাঁইও না ন্যায়
মুই বোলে এ্যালাও ছোট
মোক দিয়া কিছুই হবার নয়॥
এক্কা দোক্কার ঘাঁই দেঁও মুই
খেলায় ওমরা সগাঁয়
মুই বোলে খাটো মোটা
দৌড়িবারে না পাও॥
মনে মনে হইছোং আগও
আর কয়টা দিন যাউক
শরিলোত তখন জোর হইবে
মুটকি ফাটাইম ওমার নাক॥
ছ্যাংড়া বেংরা সবার তখন
মুই হইম সগার মাথা
এলাকার সাধ তুলিম তখন
দেখাইম তখন বাও॥

ছোটদের ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

আমি বড় হবো বড় হয়া
হবো দ্যাশের রাজা
ইচ্ছা মতো দিবো আমি
নানাচ দিবো সাজা
নানাক দিবো স্কুলেতে
সবাইকে তখন সাজা॥
মাষ্টার হবো আমি
আমার কথায় চলবে তখন
বাড়ির বড় নানী
শাসন করার কতো কৌশল বুঝবে তখন মজা॥
বাঘের খাঁচাত পাঠায় দিবো
বাড়ির ছোট নানীক
এই ঝগড়া করার সাধ মিটিবে
কাঁদবে নানা নানী
বাসিয়া খাবার খাইবে ওমরা আর আমি খাবো তাজা

ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

মনের কথা কথারে না বুঝিলে ব্যাথারে
পিরীতি হয় ক্যামনে
ওরে ভাঙ্গা মন মোর জোড়া লাগে না
ঐ কারণে॥
পিড়ীতিত পড়িয়া দেখো রাজা ফকির হয়
ভাবের কথা বুঝলে পরে ভাব করা যায়
না বুঝিলে ভাবের কথা ভাব হয় ক্যামনে॥
উপর দিকে পানি দিলে নিচের দিকে ধায়

যায় বোঝে না মনের কথা তাকে কে বুঝায়
বয়স কালে মোর চলিয়া যায় বুঝবে কোন জনে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

মনের মানুষ খুজিয়া পান ভাবী
ধরলা নদীর পাড়ে
না কুন তাক মনের কথা ভাবী
মনটা ধড়পড় করে॥
দারুণ জ্বালায় জ্বলছে ও তাই
বুঝনু মুখও দেখি
বুক ফাটে তার মুখ ফোটেনা ভাবী
করে উকি ঝুকি
সউগ কথা তাক কবার কন ভাবী
খুলিয়া মোর আগে॥
মনের কথা যদি মনোত থাকে
জ্বালা বারে বেশি।
তুষের আগুনের মতো জ্বালা
কাই দিবে তাক নিভি
পাও ধরিয়া কও ভাবী তোক
মিলন করো মোরে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর : শ্রী অনন্ত কুমার দেব

দিনাজপুর লিচু ভাইরে রাজশাহীর আম
উত্তর বঙ্গে বাড়ি হামার হে
হামরা কই ভাওয়াইয়া গান॥
নাটোরের কাঁচা গোল্লা, বগুড়ার দই
পীরগঞ্জের মালশিরা ধান
ভাজিয়া নিমো খই
বন্ধু ভাজিয়া নিমো খই

মাখিয়া মাখিয়া খামো হামরা দিমো জোরে টান॥
গাইবান্ধার রস মঞ্জরী
নীলফারমারীত বসি
রাম সাগরে খামো বন্ধু
হামারা হাসি হাসি
বাটা ভরা পানা সুপারি গাল ভরেয়া খান॥
তাঁতের শাড়ি পাইতে হইলে
যাইবেন পাইতলা পুড়ি
গরুর গাড়িত চড়বেন যদি আইসে চিলমারী
হারাগাছের বিড়ি শিল্প হামার দেশের মান॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : গঙ্গাধর দাশ

তুই মোর সুন্দর হে মামা, মামা মুই তোমার ভাগিনী
ও রে রাস্তায় পথে দ্যান মোকে গুয়া মামা লোকের জ্বালানি রে॥
আমার বাড়ি তোমার বাড়ি, মামা মধ্যে বাঁশের আড়া
ও রে হাতে হাতে গুয়া দিতে মামা দেখছে ছোট দেওরা রে॥
আমার বাড়ি যান ওরে মামা বইসতে দিবো পিড়া
ওরে জল পান করিতে দিবো মামা সরু ধানের চিড়া
সরু ধানের চিড়া হে মামা, মামা বরণী ধানের খই
ওরে চালোত আছে চম্পা কলা মামা গামছা বান্দা দইরে॥
তোমার বাড়ি তোমার বাড়ি, মধ্যে ধারের নদী
ওরে কেমন করি হবো পার রে, মামা পাখা নাই দেয় বিধি রে॥
আমার বাড়ি যান মামা হে
আমার বাড়ি যান রে মামা, বসতে দিবো মোড়া
ওরে হৃদয়ে হেলান দিয়া রে মামা বাজান রসের দোতরা॥

(বাঁশের আড়া-বাঁশ ঝাড়, উপরের গান দুটিতে রূপ কাঠামো একই; উভয় গানের প্রভাব আছে। উত্তর বাংলার পল্লীগীতি চটকা খণ্ডে পৃষ্ঠা-৯১ উল্লেখ করা হয়েছে। এ গানটি ১৯৪১ সালে শিল্প গঙ্গাধর দাশ রেকর্ড করেন।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও কি মইষাল বন্ধু রে,
বকনা মইষের দুধ ধরি
যান মইষাল আমার বাড়ি
খায়া আইসেন নবীণ বাটার পান
খায়া দ্যাকেন মইষাল ক্যামন মজা পান॥

মইষ চড়ান ওরে মইষাল কোন বা ঝাড়ের মাঝে
মইষ চড়াই ওহে কইন্যা ঘাটের উজানে
ঘাঁনটির ডাং কি নাই শোনেন কানে?
মইষ চড়াই ওহে কইন্যা শান বান্ধা ঘাটে॥

তোর মইষালের এমনি মায়া বুঝাইতে না মানে দেহা
তোমার সনে মইষাল ক্যামনে হবে দেখা?
মাকালের ফল রে যেমন; মোর নারীর যৈবন তেমন
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন; মোর নারীর যৈবন তেমন
ও কি মইষাল বন্ধু রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও মইষাল বন্ধু রে॥
মহিষ চরাইতে যান মোর মইষাল ও মহিষবন্দির পাথার
বড় মহিষটাক ধরি খাইলো লঙ্কার ভূকিল বাঘে
ও মইষাল রে॥
মহিষ চরাইতে যান মইষাল হস্তে করিয়া ব্যানা
তোর পরনে লম্বা ধুতি, মোর পরনে ত্যানা
মহিষ চরাইতে যান মইষাল হস্তে করিয়া ব্যানা

তোর পরনে লম্বা ধুতি, মোর পরনে ত্যানা
মহিষ চরাইতে যান মইষাল হামার খুলি দিয়া
মুই সুন্দরী চায়া দেঁখো ভাঙ্গা টাটি দিয়া
তখনো না কচনু মইষাল, মোকে কর বিয়া
মোর বিয়া যাইবে মইষা, তোমার খুলি দিয়া॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও কি মইষাল বন্ধু রে,
বকনা মইষের দুধ ধরি
যান মইষাল আমার বাড়ি
খায়া আইসেন নবীন বাটার পান
খায়া দ্যাকেন মইষাল ক্যামন মজা পান॥

মইষ চড়ান ওরে মইষাল কোন বা ঝাড়ের মাঝে
মইষ চড়াই ওহে কইন্যা ঘাটের উজানে
ঘাঁনটির ডাং কি নাই শোনেন কানে?
মইষ চড়াই ওহে কইন্যা শান বান্ধা ঘাটে॥

তোর মইষালের এমনি মায়া
বুঝাইতে না মানে দেহা
তোমার সনে মইষাল ক্যামনে হবে দেখা?
মাকালের ফল রে যেমন; মোর নারীর যৈবন তেমন
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন; মোর নারীর যৈবন তেমন
ও কি মইষাল বন্ধু রে॥

ও মইষাল বন্ধু রে॥
মহিষ চরাইতে যান মোর মইষাল ও মহিষবন্দির পাথরে
বড় মহিষটাক ধরি খাইলো লঙ্কার ভূকিল বাঘে
ও মইষাল রে॥
মহিষ চরাইতে যান মইষাল হস্তে করিয়া ব্যানা
তোর পরনে লম্বা ধুতি, মোর পরনে ত্যানা
মহিস চরাইতে যান মইষাল হামার খুলি দিয়া
মুই সুন্দরী চায়া দেঁখো ভাঙ্গা টাটি দিয়া

তখনো না কচনু মইষাল, বাড়িত দেও রে চুয়া
মুই সুন্দরী জলোত, গেইল বাড়ি হইবে ধুয়া
তখনো না কচনু মইষাল, মোকে কর বিয়া
মোর বিয়া যাইবে মইষাল, তোমার খুলি দিয়া॥

(ত্যানা- ছেঁড়া কাপড়, চায়া- চেয়ে থাকা, ঘানটি-মহিষের গলার ঘুঙ্গুর, চুয়া-কুয়া, সূত্রঃ মাসিক মোহাম্মদী ৩৩ শত বর্ষ, ৭ম সংখ্যা- বৈশাখী ১৩৬৯)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কোন দ্যাশে যান মইষাল বন্ধুরে,
মইষে পালো লইয়া
ওরে আইজ ক্যানে বা মইষাল তোমরা
মইষের বাতান থুইয়া রে॥
এ্যাতোদিন আইচলেন মইষাল,
মইষ চরাইচেন মাঠে।
ওরে মুইয়ো নারী আলোছালে
আইসোঁ নদীর ঘাটে রে॥
ওরে মুইয়ো নারী কাপড় ধোঁও
যবুনা নদীতে
দোতরা বাজান তোমরা মইষাল,
মইষের পিটিতে চড়ি
মুইয়ো নারী বাজনা শোনো
কাপড় ধোয়া ছাড়ি রে॥

(আলেছালে- এলোমেলো ভাবে, বিননা-এক ধরনের ঘাস, অনেকটা কাশিয়ার মতো। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে
এ কোন করিলাম পিরিত, গাচে নউতোন পাতা
এলা ক্যানে ছাড়েন পিরিত, কয়া নিটন কতা রে
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

যকোন করিলাম পিরিত কলার গাচে আড়ে
এলা ক্যানে ছাড়েন পিরিত, ঘাম মাসিয়া জাড়ে রে
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

আমার বাড়ি যাইও মইষাল বইসতে দেমো মোড়া
জল খাওয়ার দেমো তোমাক শালিধানের চিরা রে
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
মইষ চরাইতে যান রে মাইষাল অরোনা জঙ্গোলে,
অরোন মইষে খাইবে ধান, বান্ধিয়া মাইরবে তোরে রে
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
মইশ আকো অই না মইশালরে, মইশাল অই না মইশ বাতানে
তোমাক দ্যাকিতে আইলাম, পানি নিবার ছলেরে।
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
তুমি যদি যাওরে মইশাল কাঁইদবে আমার হিয়া,
ঘাড়ের গামছা দিয়া যাও, থাকিম বুকে দিয়ারে।
প্রাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

(অরোন্যে-অরণ্য, আকো-রাখো, নউতন-নতুন, পাণ-প্রাণ, জাড়ে-শীতে। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১০৫)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

মইসও রাখ মইষাল বন্ধুরে, ক্ষীর নদীর পারে
অরণ মইষে খাইলো ক্ষেত গো, বাইন্ধা নিক তোরে।

পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
মাইর না ধইর না গিরস্তরে, হাতে না দিও দড়ি,
হাতের পৈছা বেইচা দিবাম অরণ মইষের করি রে।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
আমার বাড়ি যাইও বন্ধু অই না বরাবর
উচা ভিটা কলার বাগ পূব দুয়াইরা ঘর রে।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
আমার বাড়ি যাইও বন্ধু, বইতে দিব পিড়া,
জলপান করিতে দিবাম শাইল ধানের চিড়া রে।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
মেঘ আনধাইয়া রাইত গো বাঘের বড় ভয়,
তুমি কেন আইলা বন্ধু, আমি গেলা অয় রে।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

(আন্ধাইয়া রাইত-অন্ধকার, দিবাম-দিবো, উচা ভিটা-উচুভিটা। সূত্রঃ উমেশ চন্দ্র সরকার, মৈষাল বন্ধু, সৌরভ, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃষ্ঠা ১৬ এবং দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ব বঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

মনেরো হাউসে এ শাড়ি পিন্দিচোঁরে
ন্যাকারে থ্যাকারে তুলিয়া ফেলাও পাও।
পূবালা পশ্চিমা বাও, উড়িয়া যায় রে গায়ের কাপড়
বন্ধু বুঝি দেখিল রে সর্ব গাও॥
পাইকের পাতে এ ধানো শুকানুরে
গংরা পড়িয়া টুকিয়া খায়।
গংরাকে পাক ঠেকনি মারিনু,
নাগলো যায়া সোনা বন্ধুর পায়।
সোনা বন্ধু মোর গোসা হয়া যায়।
কাশিয়ারো আইলে, ওলুয়ারো আইলেরে
সোনা বন্ধু মোর গোসা হয়া যায়।

মইষ বাতানে মইষাল বন্ধু মইষ চাড়ায়,
সোনা বন্ধুক মোর কুড়া ধরেয়া দেয়॥

(গংড়া- এক ধরনের ছোট পাখি। ন্যাকারে থ্যাকারে- এলো মেলো ভাবে। সূত্র: বাংলা লোক সঙ্গীত ভাওয়াইয়া, পৃষ্ঠা নং-১০৬)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

রায়ডাক নদীর ঘাটোত বসি
দোতরা বাজাও আপন খুশি
দোতরা মোক করিছে বাড়ি ছাড়া॥
মোর দোতরার মইষালী ডাঙ্গে,
বগলোত ডাকায় চক্ষুতে ঈশিরা
দোতরায় মোক করিছে বাড়ি ছাড়া॥
ও মোর মইষাল বন্ধু রে,
না বাজান তমান খুটারে দোতরা,
নারীর মন মোর কলির যে ঘর ছাড়া
ওর একেতে সুতারো বাইজনরে
কিনা সুরে বাজে।
তোর দোতরার বাইজন শুনি মন না রয় মোর ঘরে॥

(তমান- তোমার, কুটা-কাঠ, বাইজন- বাজনা। সূত্র: লোকসঙ্গীত-স্বরলিপি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৫৩)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

এ পারে আমার বাড়ি, ও পারে বন্ধুর বাড়ি,
মধ্যে ক্ষীরল নদীর খেওয়া
ওরে কাজল ভ্রমরা গরুর রাখোয়াল রে,
মুঁই নারী কোলে বাচ্চা ছাঁওয়া॥
না জানোং ভুরা বাহিবারে
ওরে আগম দরিয়ার মাঝে কে দিবে খেওয়ারে

আমি নারী কেমন দেব পাড়ি।
বালুতে রান্ধিনু বালুতে বাড়িনু
জলে ভাসেয়া দিনু হাড়ি।
ওরে বিহার সোয়ামী মৈলে মাছ ভাত-মুই খাইম রে
ও বন্ধু মরিলে হবো আড়ি॥

(রাখোয়াল-রাখাল, আড়ি-বিধবা, ভুরা-কলার ভৈলা। সূত্রঃ বাংলা লোক সঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১০৭)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কোড়া শিকারি মোর বিনোদ রে,
নলের আগুন তলে তলে খাগড়ার আগুন জ্বলে
মোর নারী মনের আগুন বাইরে ভেতোর জ্বলে রে॥
কোড়া মারো অই না বিনোদ রে,
ঘর বান্ধিয়া বিলের মাঝে
তোমার জন্যে আমার প্রাণ ঘরে নাহি থাকে রে॥
জৈষ্টিক শাওন মাসে রে বিনোদ
কোড়ার ডাক রে ভাসে
শুনিয়া তোর কোড়ার ডাক মন মোর উড়াও পাড়াও করে রে॥
কোড়ার ডাক শুনি রে বিনোদ
আড়ার বাশা কাটিয়া
বানানো যে কোড়ার ফাঁদ এ বিলোতে বসিয়া রে॥
কোড়া কান্দে যুব্বা সারী
তোর কোড়ার ডাকে রে বিনোদ ছাইগমো ঘরবাড়ি রে॥
জষ্টি মাসের অইদে রে বিনোদ
গায়ের ঘামো ছোটে।
মুচে দেইম তোর গায়ের ঘাম এ শাড়ির আচোল রে॥

(যুব্বা-যুবতী, আড়ার বাঁশ-বাশ ঝাড়ের বাঁশ, সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১০৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

প্রাণ পিয়া সকী
ডালিম গাছে মোর ডালিম অইলো পাকি
ডালিম হয়রে ডগমগ অস পড়ে ফাটিয়া
কতই দিন আকিমো ডালিম এ গামচায় বান্দিয়া রে
বিয়ার আইতে ছাইড়ছে পড়ে ছোট যে বুলিয়া রে
যুব্বা হনু তাতো পতি না আইসে ফিরিয়া রে॥
গাচের ডালিম যেমন ভাইরে উগিগুলায় খায়
মোর নারীর ডাংগার ডালিম গড়াগড়ি যায় রে
ছিড়িবারো জিনিস নেঁয়ায় তপাতোত ফ্যালেয়া দেমোঁ রে॥
পাকি যেমোন বান্দি বাসা পলকে যায় ছাড়িয়ে
অইমোতো গেইচে পতি অবোলাক বদিয়া রে॥
ছোট হতে বড় হনু মনের আগুন জ্বলে
কোন জন দরোদি আচে মনের খবর নিবে রে
যাও কুকিল বন্দুর দ্যাশে মনের আগুন ওটে মোর জলিয়া রে॥

(দোপর আইত-দুপুর রাত, পাণ-পিয়া, উগি- রোগী। সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১০৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

মনের বড় দুঃখ রে সখি চিতে বড় দুখ
ও রে নদীর কাছারের মতো ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক
ও রে মনকে বুঝাব কত আর॥
পুরুষের বসন্তকালে হাতে মোহন বাঁশী
আর নারীর বসন্তবালে মুখে মুচকি হাসি
ও রে মন কে বুঝাব কত আর॥
মাছের বসন্তকালে করে উজান ভাটি

আর নদীর বসন্তকালে ভাঙ্গিয়া পড়ে মাটি
আর আমার বসন্তে আজি খালি কাঁদামাটি রে॥
ও রে মনকে বুঝাব কত আর॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১০৯)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

শালমলী শিমিলার গাছ তারে হইল পাঞ্চ ডাল, সই
তারে উপর বইশে কাকাতুয়া
পাড়ার পড়োশী সই য্যাও প্রাণের বৈরী
সইরে কার হস্তে পেঠাইম বন্ধুর গুয়া॥
কাকাতুয়া, বলো তোক, ঠোঁটে করি গুয়া তু
নিয়া যা প্রাণ বন্ধুয়ার দ্যাশে॥
আজি সুজন কান্ডারী হও
নৌকাত নিশ্চানো দেও রে॥
স্যাও নৌকাত চড়িয়া আসে বন্ধু
মোর নারীর লাম্বা কেশ
মটুক চুলির বেশ
মুই নারীর তুলিয়া বান্ধো খোঁপা॥

(সূত্র : বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

সখী, আর কি দেখা যাব জীবনে,
আমার দিনে দিনে তনু হইল ক্ষীণ
সখী ভাবতে ভাবতে তাহারী দুই নয়নের জলে
আমার বক্ষি ভাসে নদী॥
সখী এতোদিন ক্ষয় হইতাম
পাষাণ হইতাম যদি॥
হইতাম যদি জলের কুমারী

খুজ্যা দ্যাখতাম জলে,
সখী হইতাম যদি বনের বাঘ, খুজ্যা দ্যাখতাম জঙ্গলে
হারে দারুণ বিধি যদি দিতো পাখা রে
সখী দ্যাখতাম নয়ন ভরে॥

(খুজ্যা-খুঁজে। সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে
ঢাল বান্দেন তলোয়ার বান্দেন রে
সিপাই বান্দেন ও পাগড়ি।
যুব্বা নারী ঘরে থুইয়া কাঁই করে চাকুরি রে॥
গেইলে কি আসিবেন সিপাই রে॥
তাল বা গাড়িয়া সিপাই, গেইলেন ছাড়িয়া
সেও তাল পাকিয়া সিপাই গাছে হইলো ঝুনা রে॥
গেইলে আসিবেন সিপাই রে
বাপে মায়ে দিছে বিয়া তোমারে দ্যাকিয়া
এলা ক্যানো যান ও নারে সিপাই, আমারে ছাড়িয়া রে॥
গেইলে কি আসিবেন সিপাই রে॥
যকোন ছিলাম অকুমারী, তকোন ছিলাম ভাল রে
বানিয়া সিঁদুর সিতায় দিয়া ভাবতে জনম গেল রে
গেইলে কি আসিবেন সিপাই রে॥
তুমি যাইবে দূর দ্যাশে আমারে ছাড়িয়া
তোমার কলা বগতুলে খাবে চোচা পাবে আসিয়া রে
গেইলে কি আসিবেন সিপাই রে॥

(সূত্র : বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আজি পাঁয়রা ঘুঙ্গরা বাজে রে,
আই মুই কেমন বাইরা যাও
ঘরে মোর শ্বশুর, বাইরা হা মোর ভাসুর ও॥
আই মোর শিয়রে ননদী জাগে
ও রে কেমন করিয়া বাহির হব ও
পিরীতির আশে পিরীতির বাসে ও
ও মোর ঘুঙ্গুরা বানেয়া দিছে
কি করিম বানিয়াটাকে ও
এলা কালাই বা ভরেয়া দিছে রে॥
ও মুই কেমন বাইরা যাও
চিপিয়া ধরঙ ঠাসিয়া ধরঙ ও
আই মুই আস্তে ফ্যালাঙ রে পাও
ওরে জলের ঝাড়ি হস্তে লইয়া ও
আই মুই ঘরের বাইরা হম রে
আই মুই দেখিবারে বাহির যাও॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১২, গানটি নায়েব আলী টেপু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেকর্ড করেন।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আপন কর্ম দোষে সব হারালি
দোষ দিবি তুই কারে
মনরে পুবান পশ্চিমে বাও
রাধাকৃষ্ণের ভাঙ্গা নাও
ঠমকে ঠমকে ওঠে পানি॥
মনরে ইঙ্গলা-পিঙ্গলার ঘর

ঘুমে করেছে জড় জড়
খসে পড়ল তোর বত্রিশ বন্ধনের জোড়া॥
ওপার কদম্বের গাছ
ঝিলমিল ঝিলমিল করে পাত,
তার উপর জোড়া বগিলার বাসা
আহারের লোভে রে জমিনে পড়িয়া রে
সেই না বগা ঠেকলো মায়াজালে॥

(বগা-বক, এখানে প্রতীক হিসেবে। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১২)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আমার বাড়ি ছাড়িয়া কোথা যান,
দোহাই আল্লার মোর মাথা খান
কালা মুরগিটা ওসন বইস্যাছে॥
বন্যা আশা দিলি ভরসা দিলি
কলার মোথাত, মোক বসাইয়্যা থুলি
সারারাত মোক মশা কামড়াইছে
কন্যা আগুমনিগুমটা না বুঝিয়া
সোনার অঙ্গে ,মার ফোসা পইরাছে॥

(ওসন-তা দেয়া, ফোসা- ফোসকা। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং–১১৩)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আরে কইনার কিনা দোষ রে আছে
ও তার ঘটকশালা পাজি
ওরে একে কন্যার যমপালাটি
তাতে হইলেক দারুন উসী॥
বাম গালে তার ঢোল্ডা ফুলা

ডাইন চক্ষে তার ফলি পড়া
এক চক্ষে দেখে
আরে বরের কিবা দোষ রে॥
একে পাত্র যম পাগেলা
তাতে হইল গালাফুলা
প্যাটা ঢাপরা পিঠিত একটা দরুণ কুঁজা
সেইটে দ্যায় মোকে॥
আমি গইনা গরিবের মাইয়া
তোর সঙ্গে প্রেম করিব নারে
মোক বলে ব্যাচেয়া খায় তেমালা ঘরে॥
আমি শুনছি ঘটকের মুখে বাড়িতে পুষ্করিণী আছে
হস্তিত করিয়া নাইওর করিবে রে,
আই মোক পঙ্কিত করিয়া নাইওর করিব রে॥
মোক বলে ব্যাচেয়া খায় তেমালা ঘরে॥

(তেমালা–তৃতীয় তলা, ব্যাচে খাওয়া-বিক্রিকরা, এখানে বিয়ে দেয়া। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং–১১৪)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও কি দাদা রে
যৈবন দ্যাকিলে ছাতি মোর ফাটে
বড় দাদা মোর ব্যাপারী
তাঁইও করে কোষ্টার পাইকারী
মোর দিকি কাঁইও না দ্যাকে॥
মায়ে বলে ছোট ছোট
বাপে না দ্যায় বিয়া
আর কত মোর আকোয়াল,
তাইও চরায় গরুর পাল
মোর দিকি কাঁইও না দ্যাকে॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং–১১১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

সুন্দরী বাহির হও দেখোঁ চন্দুমুখ রে॥
হাজার টাকার গাড়ী রে গরু
লক্ষ টাকার তুই সুন্দরী
ও সুন্দরী কিসের দুঃখে তোর
নাইওর যাবার চান রে॥
বাচ্চা কালের কামাই দিয়া
তোক সুন্দরী করছো বিয়া রে,
ও সুন্দরী বাহির হও তুই
দেখোঁ চন্দ্রমুখ রে॥
এক ঘটি জলের ছলে
বারাও সুন্দরী জলের ঘাটে রে,
ও সুন্দরী ছাড় তোমার
বাপ-মায়ের দ্যাশ রে।

(সূত্র : বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১৬)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ছাড় রে ভবের খেলা
পশ্চিম ডুবিল বেলা
বেলা ডুবিল হবে অন্ধকার॥
ওরে ছাড় এ জীবনের আশা
মিছাই বান্ধিয়া বাসা
বাড়িঘর তোকে কি ধন দিতে পারে॥
ওরে নিরলে বসিয়া ভাবি
মায়াজালে বন্দি রে সবি
কাঙ্গালকে কাঁই বা রে দিবে সোনা॥
ওরে হায়রে নিদয়ার কালা

ছাড়িলেন এ ঘরের জ্বালা
ছাড়াছাড়ি হইনো দোন জনা।
ওরে আকাশেতে তারা জ্বলে,
মনেতে মোর আগুন জ্বলে,
সেই আগুনের নিবাইয়া মোর নাই॥
ওরে ভাওয়াইয়া গানের সুরে,
মন মোর কান্দিয়া ঝুরে
কান্দিয়া মরিবার যে চাই॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং–১১৭)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

জামাই ঝুনুকা বানেয়া দে॥
ঝুনকার ভর হাটিবার না পরে
জামাই পিটিত করিয়া নে (মোরে)
জামাই ঝুনুকা বানেয়া দে
জামাই এইলো হামার অসিয়া
বেটিক ছাড়ি কাছে তাঁই চাইর খা বিয়া
জামাই, ঝুনুকা বানেয়া দে॥
অসিয়া বন্ধুর অসিয়া কতা
দিবার হইলে বন্ধু থাকে আতার পাতারে
আইত হইলে তাঁই বোগোলে আইসে॥
জামাই ঝুনুকা বানেয়া দে॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-১১৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘ ম্যাঘালি, তোলাইল পুবাইল বাও।
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরী হে, ও তুমি ধীরে ক্যানে বাও।
হাড়িয়া মেঘা কুড়িয়া মেঘা, মেঘা হারিয়া নাতী,

গিসসি আইসো দেওয়ার ঝড়ি হে।
ও দেওয়া তোলাইল পূবাইল বাও,
ধীরে ক্যান বাওয়াও তরী হে॥
হাঙ্গর কুমির বন্ধু আমার নদীক কিসের ভয়
সান্তারিয়া দরিয়া হবো পার॥
কালা শাড়ি পেন্দনে চাঁদ তোর ভোগধন বাসায় গাও।
শোনেক শোনেক কন্যাহে
ও কন্যা নাওয়ে দিছেন পাও
এখন তুমি কিসের বা ভয় পাও॥
তুমিতো সুজন নাইয়া আমার কথা শোন
শিমুল খুটার নৌকা তোমার হে,
ও নৌকা তলায় জলের ভারে
শিমুল খুটার নৌকা তোমার হে॥
শিমুল নোয়ায় সেগুন নোয়ায়, মন পবনের নাও,
সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিছোং হে
ও কন্যা যদি সাথে রও,
ভয় না করি তিস্তা নদীর ঝড়॥
ওরে গগন কালা কালা শাড়ি, কালা পানির ঢেউ
কালায় কালা কালা হইলো হে
ও কন্যা আমার ভাটির নাও
ধীরে চলো সোনার নৌকা হে।
শোনেক নাইয়া ভাটির নাইয়া বলোঁ তোমার আগে,
তুমি আমার প্রা ের বন্ধুহে
ও বন্ধু কালায় কালায় দেখং
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু হে॥
ভাটির নাও মোর ভাটি চল, নাওয়ে সোনার ধন,
ধীরে চল ধীরে চল হে
ও নৌকা তীরে আমার ঘর,
ধীরে চলো সোনার নৌকা হে॥

(গানটি উপরে দ্বৈত ভাওয়াইয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া, পৃষ্ঠা নং–১১৮-১১৯)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া,
আর কত কাল রহিম ঘরে একাকিনী হয়া
রে বিধি নিদয়া॥
হাইয়া পৈল মোর সোনব যৈবন মলেয়ার ঝরে
মাও বাপে মোর হৈল বাদী, না দিল পরে ঘরে,
রে বিধি নিদয়া॥
পেট ফাটে তাও মুখ না ফোটে লাজ শরমের ভরে,
খুলিয়া কইলে মনের কথা নিন্দা করে পরে
রে বিধি নিদয়া॥
এমন মন মোর করেরে বিধি এমন মন মোর করে
মনের মতো চেংরা দেখি ধরিয়া পালাও দূরে
রে বিধি নিদয়া॥
কাঁইও কবে কলঙ্কিনি হানি নাউক মোর তাতে
মনের সাধে করিম, কেলি পতি নিয়া সাথে
রে বিধি নিদয়া॥

(জর্জ গ্রিয়ার্সন ভারত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির মুরলীধর রায় চৌধুরীর নিকট থেকে ১৮৯৮ সালে গানটি সংগ্রহ করেন। সূত্র: বাংলা লোকসঙ্গীত)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ভাল কবিয়া বাজান রে দোতরা,
সুন্দরী কমলা নাচে।
সুন্দরী কমলার পায়ের নাড়ু
নাচিয়া যাইতে বাজে রে॥
সুন্দরী কমলার পরনের শাড়ি
রোদে ঝলমল করে রে

সুন্দরী কমলার নাকের নোল
নাচিয়া ঢোলে রে॥
সুন্দরী কমলার কানের মাকরি
ঝলমল ঝলমল করে রে॥
সুন্দরী কমলার গলার মালার
নাচিয়া যাইতে পড়ে যে॥
এ বাড়ি হতে ও বাড়ি গেনু, ঘাটায়
ছিপিছিপ পানি।
গাবুরের ভিজিলি জামা জোড়া,
কইনার ভিজিল শাড়ি রে॥

(গানটি ধীরেন সরকার ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে রেকর্ড করেন। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১২০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

মুখ কোনা তোর ডিবডিব ও,
ও ভওজী গুয়া কোনটে খালু।
গালাত হইল রুদ্রমালা, রূপ
কোনটে পালু ভাউজী ও॥
জোর ভুরু কপালের লেখা ও,
ও ভাউজী দীঘিল ক্যাশের মায়া।
রসিক তোমার নয়নতারা,
তোমার হিয়াত ছায়া ভাউজী ও॥
কাঞ্চা সোনার বরণ তোমার ও
ও ভাউজী মনোত শতেক আশা,
কোন রসিয়ার বাদে তোমার
কদমতলায় বাসা, ভাউজী ও॥
ভাদরমাসী জল পায় না ও
ও ভাউজী দেহা রঙ্গে ফুটি
তোমার বাসনা পাইলে কালে,
কানাই আইসে ছুটি ভাউজী ও॥

ও দেহা তোর রইবে না আর ও
রসিক কানাই ছাড়িয়া গেইলে,
গড়বে গার কাটি ভাউজী ও॥

(গানটি ধীরেন সরকার ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে এবং ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দীন ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১২১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

যে জন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সাথে নাই লেনা দেনা।
খাঁটি সোনা ছাড়িয়া কেনে নকল সোনা,
যে জন সোনা চেনে না॥
খুটা কাটায় মানিক পাইলো রে,
অথই পানিত ফ্যালেয়া দিলো রে।
সাত আজার ধন মানিক হারেয়া,
খুটা কাটায় মোন যে মানে মানে না॥
উল্লুকের থাকিতে রে নয়ন, -
না দ্যাকে সে রবির কেরণ।
কি কব দুক্কের কথা
সে যে ভাব জানে না॥
সে জন মানিক চেনে না।
পিঁপড়ায় বোজ চিনির দাম,
আর বানিয়ায় চেনে সোনা
খাঁটি প্রেমের মূল্য কাঁই জানে,
ধরায় আচে কয় জনা। সেজন মানিক চেনে না॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১২২)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

হাত্তির উপর কার্ত্তিক পূজা
তোর সোনদরীক গেইজে বুজা
তোর ছোট বইন তিন ছাওয়াইরে মাও॥
দ্যাক শালী তুই আশেপাশে,
তোর নাইওর ক্যানে মাসে মাসে
তোর ছোট বইন তিন ছাওয়াইলেন মাও॥
বাপ চাচা ফুপায় কয়
মাসে মাসে নাইওর যায়,
সেইজন্যে তো ছাওয়ায় না টেকে॥
ছাওয়া পোয়ার হাউস করেন,
কইতে একনা ফকির ধরেন,
কইতে করেন ট্যাকা পইসার ব্যয়
কত নবাই দণ্ডীর রব মানিনু
কত দরগায় ছিন্নি দিনু,
ত্যাওঁ না হলু একনা ছাওয়ার মাও॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

চাঁদোনী রাইতোত বসিয়া ঠ্যালোত
কার সাতে খেলান টুভুয়া।
তোমাকে চিনিছোঁ তোমাকে জানিছোঁ।
তোমার হন কোকিয়ার ছাওয়া॥
তোকে না চিনিয়া মিছায়ে পুষিয়া ঠেকিল অবোধ ঢালকাউয়া।
মেঘের কওটাটি লুকাইবে চাঁদটি,
এক এক বার দেখা দেয়া ভুয়া॥
নুকায়া তোমরাও করিচেন টু রাও
এনকা কিচু নয় ভূয়া।
আছেন যে নিদোঁতে সোয়ামী ঘরোত

সে কান্নে কাঁপে মোর হিয়া॥
দিনোত খাঁটিয়া পড়চেন ঘুমিয়া,
বৈতোচে শিরশিরা হাওয়া।
তাহলে তোমাকে ফেলিবে বিপাকে।
করিবে কে তোমাকে দয়া॥
ভরিচে জোনকে, দেখা যায় সবাকে,
দেখিলে বধিবে সুয়া॥
পাকা বাঁশের নাটী ব্যাড়াতে আছে দুটী,
বুজইবে ঐ নাটী দিয়া
উড়িয়া যাইবেন কোটে, পড়িবেন এই কোটে
পলাইবেন কোন ভিতি দিয়া॥
জাগিলে ননদী বওয়াবে লোয়ের নদী
পিটিতে বিদির বাড়ুন দিয়া॥
ঘুমাইচে সব বাড়ি ক্যানে এ বাড়াবাড়ি
ঘুমাইতে সক্কলে শুইয়া॥
ঘুমাইচে সোয়ামী একেলা জাগি আমি,
জাগাও ক্যানে তুমি এ গায়া॥
শিয়রে মোমবাতি জ্বলিচে সারারাতি
শুইয়া গনি ঘরের রুয়া॥
কি হলো নাই চিন, চৌকিতে নাই নিন্
এমন হল কি রোগ হয়া॥
ও কালা কোকিলা কি গাইস একেলা,
গেলু রে মোর মাথা খায়া॥
ধরিতে যদি পরো, হৃদ পিঞ্জরে ভরোঁ
দুবাহু করিম আড়েয়া॥
পাক্কা ডালিম দিম, কত কি করিম
মুখোত ভাসাম চুমা খাঁয়া॥
মুখোত মুখ দিয়া অমত্ত ঢালিয়া
দিমরে বুকোত নিয়া॥
আদর পাবু কত সখোত হবু রত
বাপো মাওক যাবু রে ভুলিয়া॥
শুনেক রে শুনেক কুলি শিখাইম কত বুলি
যাইতে পাবুনা আর ধায়া॥

কোলাতে রাখিম কোলাতে শোয়াইম
হইবে যে তোর ভারি পায়া॥
রসিব দ্যাসে কয় ধরিলে ভাল হয়,
দোনাকে তখন যাইবে যাওয়া॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১২৪-১২৫)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।
ফাঁদ বসাইচে ফান্দি রে বাই, পুটি মাছ দিয়া
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াও দিয়া রে॥
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে টানাটানি
ওরে আহা রে কুংকুরার সুতা, হলু নোয়ার গুণা রে॥
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে হায় রে হায়
ওরে আহা রে দারুন বিধি, সাথী ছাইড়া যায় রে॥

আর বগা আহার করে আশে আরও পাশে
আমার বগা আহার করে ধল্লা নদীর পারে রে
উড়িয়া যায় রে চকোয়া পঙ্খী বগীক বলে ঠারে
ওরে তোমার বগা বন্দি হইচে ধল্লা নদীর পারে রে॥

এই কতা শুনিয়া রে বগী দুই পাখা মেলিল
ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিলো রে
বগাক দ্যাকিয়া বগী কান্দেরে
বগীক দ্যাকিয়া বগা কান্দেরে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কালা রে
কেমন করিয় হবো দরিয়া পার রে॥
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দেওয়া ঝরে
কালা মধুর রসে রে॥
ধুধু কাশিয়ার ফুল নদী হইল
কালা হুলস্থুল রে॥
যে নাইয়া করিবে পার
তাকে দিব কালা গলার হার রে
পার করিলে যৈবল করিব দান রে॥

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও ধন মোর কানাই রে
ও রে আষাঢ় শাওন মাসে
দেওয়া ঝরে কানাই মধু রসে রে
হায় রে হায়
বুকের বসন মোর হাওয়ায় ধরিয়া টানে
ওর ধর মোর কানাইয় রে॥

(উপরের গান দুইটির মধ্যে, একটি শিবেন্দ্র নারায়ণ অপরটি ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দীন সংগ্রহ করেন। আব্বাস উদ্দীন ধান কাটায় রত চাষীর কণ্ঠে উপরের অংশটি শুনেছিলেন। অপর গানটি কোচবিহার থেকে সংগৃহিত। সূত্র বাংলা। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১২১)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

আরে ও মোর ভাবে দ্যাওরা
থুইয়া আয় মোক বাপো- ভাইয়ার দ্যাশে রে॥
বাপো ভাই মোর দুরাচার
ব্যাচে খাইচে মদকিয়ার ঘরে রে॥
মদকিয়া মদ খায়
আগুন দিলে আই মোর রাতি পোয়ায় রে,
নলের ডাঙ্গে শরীল করছে কালা রে॥
এলুয়া কাশিয়ার ফুল
নদী হইচে দ্যাওরা হুলাস্থুল রে
কেমন করিয়া হই এ নদী পার রে॥
কাল নদী হইচে দ্যাওরা মানুতে ভয়,
মানুষ গরু দ্যাওরা হরিকায় রে
কেমন করিয়া হই এ নদী পার রে॥
য নাইয়া করিবে পার,
তাক দিম মুঁই গলার হার রে
পাড় করিলে যৈবন করি দান রে॥
তোর এ দ্যাওরা পিরিতের ভারে
বাড়িঘর মোর না নেয় মনে রে
দারুণ চিত মোর বাইরাং রে বাইরাং করে রে॥

টি আব্বাস
নেছিলেন।
ভাওয়াইয়া

(সূত্র: মাটির খোঁজে পৃষ্ঠা নং ৭৪, শিল্পী প্রতিম বড়ুয়া, এই গানটি উপরের গানটির সাথে অনেকটাই মিল আছে।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও নাগর কানাই রে
ও রে অবোধ কালে করিছি পিরীত, তুমি আমি জানি
এখন কেনে লোকের মুখে নানা কথা শুনি
ও রে না ও ফাটানু ফালা ফালা চালে, থুনু রে দাও
অবোধ কালে করিয়া পিরীত, আজও ঝাঞ্জায় গাও
ও নাগর কানাই রে॥
বনে বনে চরাও রে ধেনু আখোয়ালে মতি
এলা কেনে বেড়াইল তোর গোপন পিরীতি
ও রে ধানটি খাইল টিয়া
কেমন কাটাব রাত্রি বুকে পাষাণ দিয়া॥

(ঝাঞ্জার–ব্যাথা বরে আখোয়াল–রাখাল, সূত্রঃ বাংলা লোক সাহিত্য পৃষ্ঠা নং ২৭৪)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও নাগর কানাই রে
বেলা গেলো সন্ধ্যা হলো ও কানাই রে,
ও সে জ্বালে মোমের বাতি
না জানি মোর প্রাণনাথ আসবে কত রাতি॥

ও নাগর কানাই রে
রাত্র এক ফর হইল কানাঁই রে বেড়ানে দিলে মন
রাঁধিয়া বাড়িয়া রন্ন জাগাব কতক্ষণ
রাত্র দুই ফর হইল ও সে গাছে ডাকে শুয়া॥
গা তুলে খাও বাটার পান নারী কাটে গুয়া
রাত্রে চার ফর হইল কানাই রে, পোখি ছাড়ে বাসা
রাধিকার সঙ্গে প্রেম করিয়া না পুরিল আশা রে॥

(এক ফর-প্রথম প্রহর, দুই ফর-দ্বিতীয় প্রহর, রন্ন-অন্ন। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ পৃষ্ঠা নং ৫১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও সুন্দর কানাই রে
আষাঢ় শ্রাবণও মাসে
আঙ্খির জলে কানাই মাটি ভেজে
ঔদে না ঘামিল রে গাও
ও সুন্দর কানাই রে॥
দুয়ারের আগে রে কানাই
হালখানি জুড়িছ,
ঔদে না ঘামিল গাও
ধিক ধিক তোর বাপরে মাও,
ও সুন্দর কানাই রে॥

(ঔদে- রোদে, দুয়োর-দরজা, গাও-গাও। পৌরণিক কানাই আভীর সম্প্রদায়ের সন্তান ছিলেন। আর এই ভাওয়াইয়ার কানাই কৃষকের সন্তান। গ্রামের এক বলিষ্ঠ প্রেমিক যুবক। সূত্র : বাংলা লোক সঙ্গীত)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ওরে বান্ধিনু বাড়ি
গুয়া উনু সারি সারি
গুয়ার বাগিচায় ঘিরিয়া লইলে বাড়িরে॥
আসিবে মোর প্রাণের গুয়া,
তায় পাড়াইবে গাছের গুয়া,
মুই নারীটা ফাঁকিয় খাইম তাক॥
ওরে আসিবে মোর প্রাণের নাথ,
তাঁয় কাটিবে কলার পাত
মুঁই নারীটা বসিয়া খাইম বোল ভাত॥
ওকি পত্তাণ কালারে,

ওরে মহাকালের ফল যেমন,
মোর নারীর যৈবন তেমন,
খায়া দেখ কালা যৈবন কেমন মিঠারে॥

(ফাঁকিয়া-পিশিয়া, বোল ভাত-গরম ভাত, মহাকাল- মাকাল ফল)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

দাঁড়াও কালা মোর ঐনা রাজপন্থেরে,
জনমের মতো দেখিয়া নেঁও মোর প্রাণ কালারে॥
হামার কালা মানষি ভাল
যাওয়া আসা করে চিরকাল রে।
দাঁড়াও কালারে ঐ না রাজ পন্থেরে॥
জনমের মতো দিখিয়া নেও প্রাণ কালা রে॥
মোর কালার কঠিন হিয়া
মন ধরিছে কালা পাষাণ দিয়া,
দাঁড়াও কালারে ঐ না রাজপন্থে রে
জনমের মতো দিখিয়া নেও প্রাণ কালা রে॥

(সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া-ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা নং-৫৫। গানটি আবার অন্য ভাবেও এক সময় গাওয়া হয়ে ছিল। তা নিম্নে বর্ণিত হলো।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

দাঁড়াও কালা মোর ঐ না মে রাজপন্থে রে।
জনমনের মতো দেখিয়ো নেঁও মোর প্রাণ কালারে॥
হামার কালা বাড়ি আইসে,
পিড়া দিলে কালা মাটিত বইসে রে প্রাণ কালা রে॥
কালা হাতে হাতে গুয়া দিলে না খায় রে॥
আমার কালা মানষি ভালো,
না বোঝে কাল সন্ধ্যা সকাল রে মোর প্রাণ কালা রে

কালা না জানে যৈবনের পিরিতি রে॥
আমার কালার কটুর হিয়া
মন বান্ধিছ কালা পাষাণ দিয়া রে, মোর প্রাণ কালারে॥

(সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া– ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং–৫৫)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

প্রেম জানে না রসিক কালা চান,
ও মোর বুঝিয়া থাকে মন
কতদিন বন্ধুর সনে হব দরশিন বন্ধু রে॥
ও বন্ধু রে নদীর ওপারে তোমার বাড়ি
যাওয়া আইসার অনেক দেরি
যাব কি রব কি সদাই করি মানা॥
হাঁটিয়া যাইতে নদীর জল
খাকলাই করি খুকলুং কি খাল্লাউ খাল্লাউ করে রে
হায় হায় প্রাণের বন্ধু রে॥
ও বন্ধু রে একলা ঘরে শুইয়া থাকোঙ পালঙ্ক উপরে
মন মোর আবিল বিলবিল করে
গড়ো ফিরতে মরার পালং
ক্যাররোৎ কি ক্যারোৎ কি কাড়াট করে রে
হায় হায় প্রাণের বন্ধুরে॥
ও বন্ধু রে, তোমার আশায় বসিয়া থাকোঙ বটবৃক্ষের তলে,
মন মোর উড়াও পাড়াঙ করে
ভাদর মাসী দেওয়ার ঝড়ি টাপ্পাস কি ঝমঝমেয়া পড়ে রে
হায় হায় প্রাণের বন্ধুরে॥

(সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া– ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা নং–৫৫ ।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ওকি গাড়িয়াল ভাই,
উজান উজান করে গাড়িয়াল, উজানে বাঘের ভয়,
গাড়ী ধরিয়া গাড়িয়াল বাড়ি ফিরিয়া যায়॥
ভাত ও মাছো খাইয়া গাড়িয়াল
মুখে না দেয় পান
চালের বাতায় ধরিয়া কন্যা
জুড়িয়ে কান্দন
না কান্দ না কান্দ কন্যা
ভাঙ্গিব রসের গোড়া
আর একদিন ফিরিয়া আসিলে
সোনা দিয়া বান্ধিব রে গলা॥

(সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া- ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা নং-৫৬।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ধীরে বোলাও গাড়ি রে গাড়িয়াল, আস্তে বোলাও গাড়ি
আর এক নজর দেখিয়া ন্যাও মুই
দয়াল বাপের বাড়ির গাড়িয়াল দয়াল বাপের বাড়ি॥

বাপো কান্দে ওই দেখা যায়, আশ পড়শি নিকাশ ফেলায়
বাচ্চা বইনোক নিয়া কোলায় মাও কান্দে ডুকুরি॥
না জানোং মুই আন্দোন বাড়োন,
না জানোং মুই অম্বন পম্বন
না পরোং মুই কুটিবার তরকারি॥
ননদে পাড়িবে গালি
সদাই কইবে মোক ভাকুরা গালি,
সদায় কইবে মোক জরম আলসিয়ানী
মুই হনু যে দোকাপুড়ি॥

সেয়ানা হবার অনেক দেরী,
এলায় এ্যালায় ক্যানে আইলেন গাড়ি ধরি
আর কিছু দিন থুইয়া যাও
পুষিবে পালিবে মাও
না নিগান মোক ঠ্যাংগোতে নাগে দড়ি॥

(নিকাশ-নিঃশ্বাস, বইনোক- ছোট বোনকে, ডুকুরী- চিৎকার করে কান্না, ভাকুরাগালি–আজেবাজে গালি, দোকাপুড়ি–২টি কাপড়, এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ শীররের উপর অংশে কাপড় পরা, সূত্র বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া-ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা নং-৫৮ ।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ওরে নাইয়া ভাই,
বাড়ির কাছে যবুনারে নদী,
সদায় ছাইলা কোলায় হে দ্যাকি,
সদায় মন মোর বারে যাঁও বারে যাঁও করে॥
ওরে নাইয়া ভাই॥
নদীর পাড়ে ঘষণ হে মাঞ্জন,
বাড়িত আইলে কইন্যার খোপা যত্তোন
সদায় মন মোর বারে যাঁও বারে যাঁও করে।
ওরে নাইয়া ভাই॥
বাপো মায়ের এ্যামনি ময়া
নিবার আইলে কয় বাচ্চারে ছাওয়া
চিরিল শাড়ি, মোর যৈবনে ভারে রে,
সদায় মন মোর বারে যাও বারে যাও করে
ওরে নাইয়া ভাই॥
শ্বশুর আইল নিবার বুলি
ফিরি গেলে তাঁই নদীর ঢেউ দ্যাকি
সদায় মন মোর বারে বাঁও পারে যাঁও কর
ওয়ে নাইয়া ভাই॥

(সূত্র : উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য পৃষ্ঠা নং–২১-২২)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

গহীন গাঙ্গে ধরো নায়ের হাইল মোর সোনার বন্ধু রে॥
জষ্টি ও শাওন মাসে,
বিলোত পড়িয়া কোড়া কান্দে,
কোড়ার কান্দন না সয় পরাণে।
পাকির মধ্যে গাঙ্ সারো
নারীর মধ্যে চেকোন কালো
পুরুষ মইধে অসিকো ভোমরা॥
মাছের মইধে কই মাছ ভালো,
নারীর মইধে চেকোন কালো,
সুপারি কাটিনু ঘুচি ঘুচি নং এলাচি, ছাচি পান,
বাটার পান মোর বাটায় অইলো তোলা
যে নাইয়া করিবে পাড়, তাক দেইম মুই গলার হার
পার করিলে যৈবন করিমে দান॥

(জষ্টি-জৈষ্ঠ, শাওন-শ্রাবণ, কোড়া-এক ধরনের পাখি, কান্দন- কান্না, পাকি-পাখি, গাঙ্ সারো-শালিক অন্য জাতের, ছাচি পান-এক ধরনের গাছ পান, করিমোঁ- করবো, সূত্র : উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

সোনার নাইয়া ভাবের বন্দু মোর গেইচে ছাড়িয়া রে॥
কি বান মারিলে নারীর হৃদয় চাহিয়া॥
এলুয়া কাশিয়ার ফুল,
নদী হইল কানাই হুলস্থুল রে
যে নাইয়া করিবে পার,
তাক দেইম মুই গলার হার রে॥
যদি বন্দুর নাগাইল পাঁও
ছাড়িয়া দিবার নঁও রে
সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দুর নাগাইল পাঁও

ছাড়িয়া দিবার নওঁরে,
সোনার নাইয়া ভাবের বন্‌দু মোর
গেইচে ফাঁকি দিয়া রে॥
আগে যদি জানতাম বন্‌দুরে যাইবেন ছাড়িয়া,
কোলে ছাওয়া ফ্যালে দিয়া আকিতাম বান্ধিয়ারে॥
সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দু মোর গেইছে ছাড়িয়ারে॥

(আকিতাম–রাখিতাম, নাগাইল– দেখা, ছাওয়া– কোলের সন্তান,)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আরে ছন্‌ছন্ ছন্নাত,
ডাইলোত বোলে ফোড়ন কম হয়
খাবার বসিয়া না খাবার পায়,
মোর পাণের নাথ॥
থরে বিথরে গাইল পারি কয়
ট্যাঙনা গড়ীর জাত
বিচনা পাইড়বার গেইলে
বিচনা হয়া যায় জড়ো,
পেন্টি নিয়া দৌড়িয়া আইসে
শাও দিয়া কয় মরো॥
বিচনাত্ শুতবার গেইলে
সরিয়া শুতবার কয়
ও মোক সরিয়া শুতবার কয়
মোর সোয়ামীর গোসা দ্যাকি পানে নাগে ভয়॥

(বিচনা-বিছানা, পেন্টি- গরুকে পিঠানো জন্য বাঁশের তৈরি এক ধরনের লাঠি, শুতবার-শোবার)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

ওরে পতিধন,
বাড়ি ছাড়িয়া না যান
কালা মুরগিটা উষুম বসিচে॥
ওরে তোমার দাদার বউওক কইচোং
ধান বানিয়া বশোত থুইচোঁ
কলসি কতক চাড়ায় দেয় সেন পানি॥
ওরে পতিধন
হাত বাসকোত গুয়া পান
চাপ খুটিতে থুইচোঁ ছোড়ানী॥

(উষুম- তা দেয়া, কলসী– কলস, বশ-লাইয়ের খোল)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

আজি হস্তি বন্দি হইলে, গালাত দিয়া রসি
মুইও মাহুত বন্দি হইসুঁ করিয়া পিরিতি॥
সুন্দর মাইগো,
আকাশেতে চন্দ্র নাই রে কি করিবে তারা
যেই হস্তিরো মাহুত নাই, দিনে আন্ধিয়ারা॥
ম্যাঘতে জলো নাইরে পর্ব্বত কেনং ঝুরে
যে হস্তিরো মাহুত নাই মন বা ক্যামন করে॥
ঘোপেতে নাইরে পায়রা, কি করে তার খোপে
যে নারীরো ভাতার নাই, কি করিবে তার রূপে॥
দুয়ারের আগত ন্যাটেরা ঘাস, বলদে না খায় ঘিনে
আলোয়া চালের ন্যাটেরা ভাত চেংড়ী মাইয়ার গুণে॥

(উপরের গান দু'টিতে কলি অভিন্ন। কথান্তরে উল্লেখিত গান দু'টি বিরুয়া বা মাহুত বন্ধুর গান। সূত্রঃ উত্তর বঙ্গে লোকসঙ্গীত, পৃষ্ঠা নং-৪৯৪)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

শিল্পী : সুরেন্দ্র নাথ বসুনিয়া

কত পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে
ফাগুন মাসে অধিক জ্বালা,
চৈত্রে নারীর বরণ কালা রে,
বৈশাখ মাস গেল কন্যার কান্দিতে কান্দিতে॥
পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে॥
জৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল,
আষাঢ় মাসে নয়া জল রে,
শাওন মাস গেল কন্যার শয়নে রে স্বপনে॥
পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে
ভাদ্র মাসে আউলা ক্যাশ
আশ্বিন মাসে বর্ষার শ্যাষ রে,
কার্তিক বাইন্ধাছ পতি মনেতে॥
অঘ্রাণ মাসে হেমন্ত ধান,
পৌষ মাসে শীতের বান রে,
মাঘ মাসে গেল কন্যার উঠিতে বসিতে
পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে॥

(আউলা-এলোমেলো অগোছাল, ভদ্র-ভাদ্র মাস। সূত্রঃ লোকগীতি-স্বরলিপি, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা নং–১৪)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

শাক তুলং মুঁই নাতারি পাতারি, শাক তুলং ঢেকিয়া
কাশিয়া কাটিয়া এড়িয়া আসিনু, বান্ধিলু বান্ধেলা রে
প্রাণনাথো, কাল নিছে নাথে হারানো তোকে॥
তোমার রে বাড়ি হামার রে বাড়ি নাথো, মধ্যে হীরানদী,
হাত ধরিয়া পার করো নাথো, জলে ডুবিয়া মরি হে নাথো
প্রাণনাথো, কাল নিছে নাথো, হারানো তোকে॥

ঘরে আছে পুষ্পের পালক, স্যাও রইলা পড়িয়া
মুঁই নারী অভাগিনী নাথো চৌদিকেতে ধুয়া হে নাথো
প্রাণনাথো, কাল নিছে নাথো, হারানো তোকে॥
গাছের বল হৈল লতা, আরো পাতা নাথো
পুরুষের বল হৈল টাকা আরো পয়সা নাথো
নারীর বল সোয়ামীরে
প্রাণনাথো, কাল নিছে নাথো হারানো তোকে॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া, ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং-৬৭)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে॥
সোনার নাংগোল উপার ফাল
তাক দিয়া মোর কুরুয়া জুড়চে হালো রে,
মোর সোনার কুরুয়া ধুলার বা আন্দিহারো রে॥
মোর শাড়ির আঁচল দিয়া তোর কুরুয়ার
বাড়ি দেইম মুঁই ধুলা রে,
ওরে কুরুয়া হায় হায়॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া, ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং–৬৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ছাড়ো কুড়ুলা বন্ধুরে দেশের ময়হা রে॥
সোনার লাঙ্গল উপার ফাল,
দুই কুড়ুলা জড়িছে মৈষের হাল রে,
পূবিয়া পছিয়া বাও, দুই কুড়ুলা

ধুলায় আন্ধিগারা রে॥
পরনেরো অঞ্চল দিয়া,
মুছাও কুড়ুলার ওই না গায়ের ধূলা রে॥
কও কুড়ুলা, বন্ধুয়া কেমন আছে রে॥
আছে বন্ধু ভালে ভালে
দিন চারী বন্ধু জ্বরে গেইছে রে॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া, ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং ৬৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

না কান্দি;ও না কান্দিত কুরুয়া রে,
কুরুয়া ওই না বৃক্ষে পরি
ঘট বসাইনা কইরচে কালি রে,
হলং গাবুর বয়সে রাড়ি॥
না ফরাইচে মনে আশা রে,
হলুং কাঞ্চা শনের রাড়ি
কিমইন নাগে আয়না কাকইরে
কাগ মুই দেখাম পিছা পাড়ি
মরিয়া গেইচে বিয়ার স্বামী রে॥
ও মোর আউলা হইচে খোপা
ঘরে নাই মোর প্রাণ পতি রে
কাগ মুই দেখাম দেহার শোভা।
বাপে দিছে গয়নাগাটি রে
আরে বাসকো ভরা শাড়ি
ঘরে নাই মোর প্রাণ স্বামী রে॥
কাগ মুঁই দেখাম শাড়ি পরি
গাছের শোভা লতাপাতা রে,
বাড়ির শোভা নারিকেল গুয়া
নারীর শোভা প্রাণপতি রে,
ওই না মায়ের শোভা ছাওয়া॥

(রাড়ি-বিধবা, কাগ-কাকে, কাকই-চিরুনি। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়াঃ ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং-৬৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কুকিলার কুহুকুহু রে,
আরে মোর মইওরের ফ্যাকম
কোন দ্যাশে থাকিয়া ও মোর বন্ধু দেখালু স্বপন
বালাই দেঁও তের পীরিতের মাথাত রে॥
ধন-কাঙ্গালী সাউধের ছাইলার রে,
আরে মোর ধনক নাই গো মন,
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা ও মোর বন্ধু বৈদেশে গমন
বালাই দেঁও তোর পিরিতের মাথাত রে॥
গাছ মধ্যে শিমিলার গাছ রে
আরে মোর স্বরগে ম্যালে রে ডাল
নারী হয়া এ যৈবন ও মোর বন্ধু রাখিম কতকাল
বালাই দেঁও তোর পিরীতের মাথাত রে॥

(উপরের গানটি প্রায় একই রকমভাবে রচিত। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং-৬৯)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কোন বনে ডাকিল কোকিল রে
ও মোর কোকিল হিয়ায় নাগালু ময়া রে॥
সুবর্ণের পালঙ্কের কোকিল আচনু মুই শুতিয়া
ওরে তুই ক্যানে ডাকিলু কোকিল মুকে গান ভরিয়া রে॥
শাল শইলের বুক্কে কোকিল বসিয়া কাঁদাও বন,
কি বা গান শুনাইনে মোরে ঘরে না অয় মন রে॥
যৈবোন জোয়ারে কোকিল ভাসিয়া চলি আমি,
ওরে ক্ষিরোল নদী পাংকা হ্যালে দ্যাকিয়া যাইও তুমি রে॥

(দ্যাকিয়া- দেখিয়া, বুক্কে-বুকে। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া, ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং ৭০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

সকালে গেছিলুং নদীর ঘাটে
ও মোর চকোত রে জোড়া দেখি পরাণ ফাটে
কোনটে বন্ধু মোর বসিয়া॥
দেখা দিয়া যাও আসিয়া রে
পন্থ চায়া মোর ঐ নসয়ো না কাট
ওরে মালা না গাঁথিয়া,
থাকোং মুই না বসিয়া রে
গলাতে দেওয়াই নাই তা, পাও এলা কোটে॥

(কোটে-কোথায়, গেছিলং-গিয়েছিলাম। সূত্রঃ বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিত,পৃষ্ঠা নং ১২৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও কি দৈয়াল রে,
আর কতকাল রাখিব সোনার যৈবন
দোলা মাটির কালা দৈয়ল,
হলফল হলফল করে।
বহুদিনের গোপন পিরীত
মন না রয় মোর ঘরে।
না যান না যান ও মোর দৈয়ল,
না যান মোক ছাড়িয়া,
ওকি দৈয়াল রে॥
আর কতকাল রাখিব সোনার যৈবোন
শেষের কথা কও রে দৈয়ল শেষের কথা কও
নেদান কালে ওরে দৈয়ল, যেন তোমার চরণ পাও॥
ওকি দৈয়ল রে
আর কতকাল রাখিব সোনার যৈবোন॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া, ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং-৭১, পরবর্তী গানটি আবার অন্য কথান্তরে দেখতে পাই)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

দোলা মাটির কেলা দইয়ল রে,
হলকল হলকল করে,
আজি ও ইনং নারীর যৈবনরে,
দিনে দিনে বাড়ে॥
বাপো মাও মোর নিদয়া রে,
ব্যাচেয়া না খায় ছোটত
যৈবন ঢুলে মোর পূবাল বাতাসে॥
ওকি দইয়ল রে
কার বাদে আখিমো সনার যৈবন রে

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত, ভাওয়াইয়াঃ ওয়াকিল আহমদ পৃষ্ঠা নং-৭১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ওরে বগিলা রে,
ঝাঁক ঝাঁকে উড়ি যাও রে উজান দেশ
তুই যাইস আগে আগে
তোর বধু যায় রে সাতে সাতে রে॥
বৃক্ষডালে করিস পরবাস
রে মুই নারী ফাল্গুন মাসে,
জলিয়া মারোং হা-হুতাশে রে,
পতিধন মোর গেইছে পরদেশ
ওরে গদাধরের উজানেতে
দেবোধর্মার পাটের কাছে রে
বধু গেইছে বণিক পরদেশ॥
ওরে গদাধরের উজানেতে
দেবাধর্মার পাটের কাছে রে,

বঁধু গেইছে বণিক করিবার
ওরে দেখা হইলে কবু তারে
বঁধুয়া তোর বাঁচে নারে,
তোক না দেখি হইল রে মনমরা
ওরে পরবোধ না ধরে মনে,
পরাণ বধুয়া বিনে
আউলি পরে মাথায় মটুক কেশ॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৭৩)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ওকি বাওই রে,
ওরে ঝাঁকে উড়াই ঝাঁকে পড়ে রে
বাওই তাকসেন বলোরে পাকী,
একা হয়া ডালে পড়ো ॥
সেই না দুক্কে মরি হে বাওই,
সেই না দুক্কে মরি
ওকি বাওই রে॥
ওরে গুয়া খায়া পিক ঢালিচো রে বাওই
ঠোট বা করিচো আংগা
ঠোটের ওপর মানিক অতন
বাওই তিলফোঁটা
ওকি বাওইরে॥
নলের আগে নলখগেড়া রে বাওই
বাঁশের আগায় রে টিয়া
সইত্য করি কও কতা বাওই
কইরচো নাহিন বিয়ারে॥

(তাকসেন-তাঁকে, আংগা-রাঙ্গা, অতন-রতন, কতা-কথা, বাওই-এক ধরনের পাখি, তবে এখানে প্রতীক হিসেবে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ একজন যুবক। বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-৭৪)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

চৈখ্যের মণি কাজল ভোমরা ও,
ভোমরা কোবা দ্যাশে ধাও
বুক্যের আঞ্চল পাতিয়া দ্যাঙ মুঁই
ওকানেক জিরিয়া যাও॥
শাওনে আছে বান বরিষা ও
ভোমরা ফাল্গুনে পশ্চিয়া,
চৈতের চিতাত ফুল মোর
পড়িবে ঝরিয়া॥
না যান না যান ভোমরাও
তোমরা না যান ছাড়িয়া
তুই বিনে ফুলের মধু পরিবে খসিয়া॥

(কোবা- কোনবা, চৈত- চৈত্র মাস, ওকানেক ওখানে. জিরিয়া- আরাম করা, দ্যাং- দেই বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৭৫)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

এটা কথা শোনেক মোরে রে,
নাল বাজারের চেংরা বন্ধুরে।
ও তুই কিসোৎ গোসা হলু রে
নাল বাজারের চেংরা বন্ধুরে।
নদীর বসন্তকাল রে ঐ না করে উজান ভাটি,
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না পুরুষ গালার কাটিরে
পক্ষীর বসন্তকাল রে ঐ না করে উজান ভাটি,
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না হাসিয়া কয় কথা রে॥

গাছের বসন্তকালে রে, ও ঝরিয়া পড়ে পাতা
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না হাসিয়া কয় কথা রে॥
গাছের বসন্তকালে রে, ও ঝরিয়া পড়ে পাতা
নারীর বসন্তকালে রে, ঐ না হাসিয়া কয় কথা রে॥

(কিসোত-কিসের, চেংরা- ছেলে, পক্ষী-পাখি। বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৭৫)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

একে তো ছয়ফ্যাস গুজরান, বুড়ো শাশোড়ি
ঘরের ননোদির জ্বালায় হাটখোলায় বাড়ি
বাইরা বাড়িত থাকিয়া বনদ ইশারা করেন কি,
কোলের ছাওয়ার জন্নে বনদ বারবার না পাড়ি॥
গোসা হন না সোনার বন্দু ফিরি যাও বাড়ি
একে তো দোতরার ডাং মন হইল মোর উচাটন,
পানিয়া মরা আছে ঘরোত
কেমন করি হমো দ্যাকা বন্দর সাতে
নেন্দের আলিশে হাত পড়ে বালিশে
নিশা আইতে ওহে পতি ডাকাই তোমাকে
আসিয়া বন্দ আইলচে পতে ঘরের পাচোত॥

(বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৭৬)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ওরে ঢালুয়া খোঁপা মটুক চুল
শাড়ির আঞ্চল উড়ায় বাতাসে না রে॥
ওরে মোর নারীর নব যৈবন,
তাকে দেখিয়া সোনা মোর ঢুল খেলায় রে॥
রে পূবের বেলা পৈল ভাটি,
এলাও বন্ধুর ক্যানে মোর নাই দেখা রে

ওরে আলে ছালে বান্ধিয়া গুয়া,
পাইচলা বাড়িত শাক তোলোঙ মুঁই ভূলকি মারিয়া॥
ওকি চোকি ঝিলিক ধরি
নব রঙ্গের বিষ ধরিল মোর হৃদয় মাঝারে
কি বন্ধুক দেখিতে॥
ওরে ভাসুর গেল ওঝার বাড়ি
দেওরা রইল বগলে বসিয়া না রে॥
ওরে ভাবের বন্ধুয়াক কঙ মুই ইশিরা করিয়া
এলা যাও বন্ধুয়া, কাইল মোক যান দেখা দিয়া॥

(বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৭৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

কি জন্নে কোন পরাণে রে বন্ধু,
অইল যে ভুলিয়া বন্ধু তোমার কঠিন হিয়া॥
বন্ধুরে সইনজারে সোমায় ছড়েয়া ছড়েয়া
পড়ে শ্যাস অউদের ছায়া॥
সেই ছায়ায় ভাবিয়া তোঙ্ল রে বন্দু
তোর বন্দুর পিরীদের ময়া
বন্দ তোর কঠিন হিয়া
বন্দু রে, তোর বন্দুর পিরীতের নাগি,
হনু যে দ্যাশ ত্যাগি
তুই বড় নিদয় রে বন্দ ও
তোর তাতে না হয় দুয়া॥
বন্দু তোর কঠিন হিয়া বন্দু রে হনু হয়
যদি কাল ভাবের ভাবি,
তে হইলে কি এ্যাতই ভাঁব রে,
তুমি যে অইলে ভুলিয়া বন্দু নাগেয়া দারুন ময়া
বন্দু তোর কঠিন হিয়া॥

(বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৭৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

নাউয়ের আগা হলপল
হলপল করে রে।
নাউয়ের আগা য্যামন ভাইরে
হলপল হলপল রে,
ওই মতোন নারীর যৈবান
দিনে দিনে বাড়ে রে॥
নাউয়ের আগা হলপল,
কুমড়ার আগা সরু
বাচিয়া বাচিয়া করেন পিরীত,
যাহার মাঞ্জা সরু রে
নাউয়ের আগা হলপল
ছিমার আহা ঢোল,
কনদিন আসি সোনা বন্দু
নিবে আমাক কোলে রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

প্রাণ বধুরে
আশিনো কাত্তিকো মাসে
গোম সরিষা ক্ষেতে ক্ষেতে
বছর গেলে কি করিবে চাষা রে॥
উজানি দুপুর বেলা
ভোক লাগে বন্ধু এলামেলা
ভোক বীতি গেলে না লাগে তিরিষা॥
তোমরা যাইবেন দূর দ্যাশ,
না করেন বন্ধু পরর আশ
আপন হস্তে আন্ধি খান ভাত

কোছার কড়ি সাধু না করেন ব্যয়
পরার নারী সাধু না করেন ব্যয়
পরার নারী সাধু আপন নয়
আপন হস্তে আন্ধি খান ভাত
তোমরা যাইবেন পরবাস
ঘরে উইয়া বন্ধু ফুলের গাছ
ফুলের লোভে ভোমরা পাক পাড়াবে
দাঁড়ি মাঝি ষোল জল
না বলেন সাধু দুর্বচন
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যাবেন হে
পুবিয়া পচ্ছিয়া বাও
ঘোপা চায়া সাধু আটকান নাও
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যাবেন হে
আইসতে যাইতে বছর বারো
এ যৌবন কি রাখতে পারো,
থাকেন কন্যা ইশ্বর ভরিয়া॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘামে রে
যে জন বধুয়া হবে
ঘাম মুছিয়া কোলে লবে
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে॥
শাক তোলো মুঁঞ নাতারি রে
শাত তোলোঁ মুঁঞ পাঁতারি রে,
আজি শাক তোলোঁ মুঞঞ পাতারি রে
আজি শাক তোলোঁ মুঞঞ বাড়ির চতুর্দিকে রে॥
এক নোটা তুলিতে ফির নোটা ভরিতে
ওরে ছিড়ি পইল মোর গলার চন্দহার রে
মাও নাই যে বলিম ভাই নাই যে কহিম
আজি কে তুলিয়া দিবে গলার চন্দ্রহার রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

যে মোরে করিত রে পার
দান করিতাম গলার হার
পার হইয়া যৈবোন করিতাম দান॥
ওই পারে বন্ধুর বাড়ি
এই পারে মুঁই নারী
মধ্যে আছে ক্ষীরোল নদীর ধারা
বালুতে আধিনু বালুতে বাঁধিনু জলে ভাসাইয়া দিলাম হাঁড়ি
আর বিয়ার সোয়ামী মইলে খাব মাছ আর ভাত রে,
আর প্রাণ বঁধুয়া মইলে হব আড়ি
না জানি সাঁতার রে, না জানি পাতার
না জানি ঘুর‍্যা বাইর
আমি অকুল দরিয়ায় কেমনে হব পার।

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮২)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

বেলা ডুবিল সইনজা লাগিল রে,
নাগোর, জ্বলে ঘিউয়ের বাতি
আন্দিয়া বাড়িয়া ভাত রে
নাগোর জাইগবো কত আতি রে
নাগোর আয় রে আয়॥
মাউগ মরাটা বইদ্যাশ ছাড়া রে
নাগোর আগুন নাগুক রে চালে
সোনা বন্দুর দ্যাশে হে নাগোরে
নাগোর আয় রে আয়॥
হাত ভাঙ্গিবো, পাও ভাঙ্গিবো রে নাগোর,

ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিব রে হাঁড়ি
আইজ আইতে পয়ো যামো রে নাগারে
সোনা বন্দুর বাড়ি রে নাগোর
নাগোর আয়রে আয়॥
বন্দুর বাড়ি আমার বাড়ি রে নাগর
মইদে খ্যাড়ের রে পালা
তারে তলে থুইয়া আইলচোঁ রে
চিড়া মালভোগ কলা রে, নাগোর
নাগোর আয়রে আয়॥

(আতি-রাত, মাউগ-হীন চরিত্রের মেয়ে বা স্ত্রী লোক। পালা-খড়ের পালা, গাদা। আইলচোঁ- রেখে আসা, পলেয়া-পালিয়ে। সূত্রঃউত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃষ্ঠা নং ২০-২১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

সালার দোতরা
মোক কল্লু তুই দ্যাশ ছাড়া
দোতরা বাজাইলেন চ্যাংড়া আসতায় বসিয়া
পরের দিন কান্দিচোঁ চ্যাংড়া মুঁই মাথাতে হাত দিয়া॥
মোর চ্যাংড়া বন্দুর মোন
তোমার জইন্যে আকচোঁ মদু করিয়া যত্তোন॥
গান করিবার গেইলাম রে ভাই নাউয়ার হাটোতে,
সোনদোর এই কন্যা ছিল সেই জাগাতে
দোতরার ডাংগোতে চেংড়ি বাইর হয়া আইসে
ও চেংড়া বন্দু ধন,
ব্যাজার কেনে তোমার মন
আইসেন বন্দু সইন্দার রে সময়
আইসেন বন্দু জলদি করি
বুড়ার বেটা নাইরে বাড়িত,
আইসেন বন্দু খানকায় চলিয়া॥

(আকচোঁ- রেখেছি, মদু-মধু, সইন্দা-সন্ধ্যা, খানকায়-জরুরি। সূত্রঃ উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য, পৃষ্ঠা নং ৮৪)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও মোর বাউদিয়া রে,
হানিলো তুই মোর কাঞ্চা মেঘে
তোর বাউদিয়া কিনা খানু
ময়াজালে বন্দি হনু
তুই বাউদিয়া হবো গসা
মোর নিরাশীর খাবো মাথা॥
আইসেক বাউদিয়া কোলে কর
চপর আতি কান্দিয়া মর
ও মোর বাউদিয়া রে॥
তোমার বাড়ি হামার বাড়ি মইধ্যে হীরা নদী
হাত ধরিয়া কর পার, জল খাইয়া মরি
তোমার বাড়ি হামার বাড়ি মইধ্যে ব্যাতের আড়া
দিনা চারিক পিরিত করিয়া হল ময়হা ছাড়া
ও মোর বাউদিয়া রে॥
তোমার সে বড় বুদ্দি। দিবার চালো ছিরি আংটি
দুবার আংটি দিয়া রে মন ভুলালি
দিবার চালো ঢাকাই শাড়ি
কেলার পাতো দিয়া মোর মন ভুলালি
যেলায় দিবো ঢালা ফোতা
এখন ছাড়িমো গাবুর বেটা
ও মোর বাউদিয়া রে
হানিলো তুই মোর কাঞ্চা মেঘে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮৪)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও মোর চান্দ রে, মোর সোনা
ও মোক ছাড়িয়া না যান বৈদ্যাশ বন্দরে॥
রাইতে চান্দ সোনা ফুটিবে, তুমি চান্দ মনে ফুটিবে

তাতে মন মোর হাতাশে উড়াইবে, মোর সোনা রে,
ও মোর সোনা, তাতে মন মোর
শূন্যতে উড়াইবে সোনা রে॥
ও মোর চান্দ, মোর সোনা,
ও মোক ছাড়িয়া না যান, দূর দ্যাশান্তরে॥
বরিষাকাল আসিবে, জলে সুঁদি হোলা ভাসিবে
তাতে শূন্যতে উড়াইবে, মোর সোনা রে,
তাতে মন মোর হাতাশে উড়াইবে, মোর সোনা রে॥
ও মোর চান্দ রে মোর সোনা,
ও মোক ছাড়িয়া না যান একেলা রাখি ঘরে
জলহারা মাছ যেমন, বন্ধু ছাড়া মুঁই তেমন,
তাতে মন মোর হাতাশে উড়াইবে মোর সোনা রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮৬)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : ধীরেন সরকার

ও মোর বানিয়া বন্ধুরে
দিবার চাইলেন নাকের নোলক
ছাড়িয়া গেইলেন রে॥
যে জন সোনার বানিয়া হয়,
নিক্তিক করিয়া সোনা
মোকে ওজন করিয়া দেয়॥
হাতের নিলেন, কোচের নিলেন
ঠেকাইলেন মোক নিধুয়াতে
চোখের পানি পিরীতের কথাতে॥
যে জন সোনার বানিয়া হয়
ওরে বানিয়া সোনায় রূপায় মিশাল করিয়া
নোলক বানেয়া দেয়
ওরে বানিয়া বন্ধু রে কবজ গড়েয়া দে,
ওরে বিয়ার সোয়ামী মরিয়া গেইচে স্বপনে আইসে
ওরে বানিয়া বন্ধু রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮৬)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

নৌকায় চড় নৌকায় চড় রে কইন্যা, চল আমার বাড়ি,
উজানে আমার বাড়ি রে কইন্যা,
ভাটি বাণিজ করি করে কইন্যা, নৌকায় চড়॥
রূপ দেখোঁ তোর সরিষার ফুলের কইন্যা,
যৌবন যায় রে ভাটি।
হাড়িয়া মেঘ যেমন মাথার চুল রে কইন্যা,
আমার পরাণ নিলেন হরিয়া রে কইন্যা, নৌকায় চড়॥
চইদ্দ ডিঙা ধন জন রে কইন্যা,
সক হবে রে তোমার
আমার রাজ্যের রানী হইবে রে কইন্যা,
তোমার জনম যাবে সুখে রে কইন্যা, নৌকায় চড়॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্প : নায়েব আলী টেপু

বাণিজ্ বাণিজ্ করেন মোর প্রাণ সাধু রে,
সাধু বাণিজ্যের কিবা রীতি।
একটা ফুলে রস সাধুরে,
সাধু খাইতে নাই দেয় বিধি॥
যখন না ছিলোঙ মোর প্রাণ সাধু রে,
সাধু বাপ মায়ের ঘরে
তখনো না গেইলেন সাধু বিদেশ বাণিজে॥
নাউ কোটঙ মুঁই ঘুচিঘুচি রে,
সাধু চালে থুইয়া দাও
শিশুতে করাইবেন বিয়ারে, সাধু এলাও গোঁদায় গাও
সোনা নোয়ায় রূপাও নোয়ায় রে
সাধু অঞ্চলে বান্ধিব॥

চালের কুমুড়া নোয়ায় রে, সাধু পরোক কি বিলাব॥
মাথার মুকুট মোর প্রাণ সাধু রে,
সাধু কপালো নাই আর ঘেরে
কেমন ছাড়িয়া যাইবেন রে, সাধু বিদেশ বাণিজে॥
আরার বাঁশ কাটিয়ে প্রাণ সাধুরে
সাধু বান্ধু নায়ের গুরা
এবার বাণিজে যাক সাধু রে, সাধু তোমার দায়র খুড়া॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮৯)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

প্রাণ সাধু রে, যদি যান সাধু পরবাস
না করেন সাধু পরর আশ
আপন হাতে সাধু আঁধিয়া খান ভাতো রে॥
প্রাণ সাধু রে,
কোচার করি সাধু না করেন বয়
পরার নারী সাধু আপন নোয়ায় রে
ও পর নারী সাধু বধিবে পরানো রে॥
প্রাণ সাধু রে যে দিয়া সাধু তরঙ্গ ধার
সে দিয়া সাধু বালু চর য‍্
ও গহিন ধারে সাধু বয়া দেন নাউরে॥
প্রাণ সাধু রে,
প্রবেরো পচ্চিয়া বাও
ঘোপা চায়া সাধু নাগান নাও
দাড়ি মাঝি সাধু আখেন সাবধান রে॥
প্রাণ সাধু রে,
যেই দিয়া সাধু সাউদ্দের ম্যালা
সেই দিয়া সাধু ছাদেন গোলা রে
ও বেচিকিনি সাধু করে সাবধান রে॥
প্রাণ সাধু রে,
তোর আছে সাধু বাপো ভাই,
মোর অভাগিনীর সাধু কেও নাই রে,
ও কোন ডালে সাধু ধৈরণে নারীর ভরা রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৮৯-৯০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও মোর প্রাণ সাধু রে, যদি যান সাধু
আশিনো কার্তিকো মাসে
গম মইয়া সাধু ভূমি রূপে
বতর গেইলে কি করিবে চাষে রে
ও প্রাণ সাধুরে ॥
আজি ডাড়ি মাঝি সাধু ষোলরে জন
কাকো না বলেন দূরবচন
মুখের প্রেমের বয়া যাবেন নাও রে
ও মোর প্রাণ সাধু রে॥
যেই ধারে তরঙ্গ রে জল
সেই ধারে সাধু বালু রে চর
গহীন জলে বয়া যাবেন নাও রে॥
যদি করেন সাধু পর রে বাস
ঘপা দেখি সাধু বান্ধেন নাও
নিজো হাতে বান্ধেন নৌকার ডোরা রে
ও মোর প্রাণ সাধু রে॥
যদি করেন সাধু পর রে বাস
না করেন সাধু পরার আশ
নিজো হস্তে আন্ধিয়া খাবেন ভাত
কছার কড়ি সাধু না করেন বয়
পর নারী সাধু আপন রে নয়
পর নারীর বধিবে জীবন রে,
ও মোর প্রাণ সাধু রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও রে ভাটির দ্যাশের আরে কবিরাজ
ভালো করিয়া দ্যাকেন ছাওয়ারে নাড়ি॥

আমাবইশ্যা মোঙ্গলবার
সেই দিনে গেচিনু ডাকার পার
চমকি উটলি ছাওয়ার গাও
কি বা ওগ হইলো রে
ভালো কয়িা দ্যাকেন ছাওয়াইল নাড়ি॥
যদি ছাওইয়াই ভালো হয়
তোমার সাতে কবিরাজ গেনু হয়,
ভালো করিয়া দ্যাকেন ছাওয়ালে নাড়ি॥
যদি পিরীত করিতে চান,
বাড়ির বগোলোত বিবাজ বাড়ি ন্যান রে
ভালো করিয়া দ্যাকেন ছাওয়াইলেন নাড়ি॥

(বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯২)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল,
তিন কন্যা জলোত যায়,
কার কা কেমন গুণ কন্যা হে
আগের জনায় যেমন তেমন
ও কন্যা গাছের জনা ওরে মন্দ।
মধ্যের জনাকার বেশি খাট,
আগের জনায় ভালো কন্যা হে॥
কোন বা দ্যাশের ঘর বন্ধু যে,
বন্ধু কিসের ব্যাপার কর,
সত্য করিয়া কও হে বন্ধু,
বিয়াও নাহি কর বন্ধু রেঁ॥
বলদ নড়াও বলদ ঢড়াও রে কন্যা,
বলদোক মারোঙ ওরে কোড়া
বলদের পৃষ্ঠে তুলিয়া নিচোঙ,
সারিন্দা দোতরা কন্যা হে॥
তালের মত গুয়া বন্ধু যে,
বন্ধু কুলার মত পান
বাটা ভরা সুপারি আছে

আমার বাড়ি যান বন্ধু হে॥
কোন দুয়াইরা ঘর ও কন্যা
কোন দুয়াইরা ঘর ও কন্যা
কোন দি তোমার ঘাটা
সত্য করিয়া কও হে কন্যা
কোনটে হমো দ্যাখ্যা কন্যা হে॥
পূব দুয়াইরা ঘর বন্ধু হে,
ও বন্ধু পশ্চিম দিয়া ঘাটা
সত্য করিয়া করিলাম কথা
বাড়িতে হমো দেখা বন্ধু হে॥

(গানটি আব্বাস উদ্দীন ও হেমলতা ঘোষ দ্বৈত কণ্ঠে গেয়ে ছিলেন। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-৯৩)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও বন্ধু রে
বন্ধু কি মায়া লাগাইলেন রে
কেমনে ভুলিয়া বন্ধু রব তোমারে
সোনার বরণী কন্যা হে॥
ও তোমার রূপের সীমা নাই
এ দ্যাশে না রব কন্যা, দ্যাশে যাবার নাই
যদি বন্ধু যাবার চাও
মনের কথা কয়া যাও রে॥
বন্ধু কি মায়া লাগাইলেন তোমারে
বাড়ি হইল মোর দূর দ্যাশে হে
ও কন্যা আমি তোমার পর
না করেন বৈদেইশার আশা
ফিরিয়া যাও নিজ ঘর
আমি তো না জানি বন্ধু রে॥
ও বন্ধু যাইবেন ছাড়িয়া
কেমন ছাড়িয়া যাইবেন বন্ধু,
নিদারুন হইয়া বন্ধু রে॥

(বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-৯০)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : ধীরেন সরকার

ও মুই বুঝনং বুঝনং বৈদেশী বন্ধুয়ার মনটার রে
ও মোক ঝুমকা বানোয়া দে
ও মুঁই ঝুমকার ভরাতে হাঁটিবার না পাও বন্ধু,
পিঠোত করিয়া নে মোরে॥

ও রে ঘরের পাচিলাত ভাঙ্গা কোদাল খান
নোলক বানেয়া দে মোরে॥
ও মুঁই রসিয়া দেখিয়া বসিনু কাইন
দিন মানে না পড়ে হাতের গাইন
একদিন যদি মরা কামাই করে
তিন দিন মরা বসিয়া থাকে॥
আরে যে জন্যে মোর বন্ধুয়া রে ধন,
জোগায়া জোড়ায় মোকে কাপড় কিনিয়া দে॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯৫, শিল্পীঃ ধীরেন সরকার রেকর্ড কৃত মার্চ ১৯৪১)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত
শিল্পী : গঙ্গাধর দাশ

আই মুই সকিন দেখিয়া বসুনু রে কাইন,
দিন ম্যানে না পড়ে হাতের গাইন
দিনে রাইতে বেড়াও বাড়া বানি
কথা কইলে পড়ে আই চোখের পানি॥
সকালে উঠি নাগায় ডাঙ্গের ধুরধুরি
বাসি মুকোত কয় মোক দে খাবার করি
একদিন যদি কামাই করে, তিন দিন থাকে বসিয়া
ওরে ছোট দেওরা, দেয় মোক কাপড় কিনিয়া॥

(সূত্র : বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯৫, শিল্পীঃ গঙ্গাধর দাশ, রেকর্ডকৃত ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

না খাই তোরুয়া রে, না খাই তোর পান রে,
না করোঁ তোর বৈদেশী পিরীতি রে॥
বৈদেশী পিরীতি রে, মাটির কলসী রে,
ভাঙ্গি গেইলে না লাগিবে জোড়া রে॥
উত্তর হতে আইল ভারী
কথা পুছোঁ মুঁইও সরাসরি
কও ভারী মোর কালা কেমন আছে॥
মোর কালা মানুষ ভালো,
না বুঝে একলা নারীর কামই রে॥
ঢেঁকি কো কাটিম রে,
ছাইল কো পুতিম রে,
কেমনে শুনিম মুঁইও চ্যাংড়া বন্ধুর গান রে॥
মোর কালা খাইবে ভাত,
কোনঠে পাইম মুঁও কলার পাত,
কোনঠে পাইম মুঁইও জায়ী মাগুর মাছ রে॥
(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯৬)

ভাওয়াইয়া

রচনা : সংগ্রহ

সুর : প্রচলিত

চিতো সখি রে,
বন্ধুর মতোন না দ্যাখোঁ কাঁহাকে রে॥
মোর বন্ধু মানষি ভাল্
না বুঝে মোর সইনঝা কাল
না বুঝে মোর এ নারীর জঞ্জাল
মোর বন্ধুয়া নাই খায় চুড়া
কোনঠে পাইম মুই ঘন আইটা দুধো রে॥
মোর বন্ধুয়া নাই খায় ভাত
কোনঠে পাইম মুঁই মাগুর মাছ রে
কোনঠে পাইম মুঁই কুরুসা রে॥

(মাণ্ডাভুরা-চিনি মিশ্রিত, চন্দন কুরুসা- এক প্রকার ছোট মাছ, সইনজ-সন্ধ্যা। ঘন আউটা বেশি জ্বালা কবা দুধ। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯৬)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আজি আউলাইলেন মোর বান্ধা ময়াল রে॥
আরে হাতীর পিঠিত থাকিয়া রে মাহুত
কিসের বাটুল মার মাহুত রে
ও রে পরের কামিনীক রে দেখিয়া
জ্বলিয়া ক্যান মর রে॥
হাতীর পিঠিত থাকিয়া রে মাহুত
থোরা কলা ভাঙ্গ
(আরে) নারীর বেদনা রে মাহুত
কিবা তোমরা জান রে॥
হাতীর পিঠিত থাকরে মাহুত
হাতীর মায়া জান
(আর নারীর মনের কথা)
কিবা তোমরা জান রে॥

(সূত্র : বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং -৯৭)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

ও কি ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে,
সেই দিন মাহুত শিকার যান
নারীর মন মোর বুঝিয়া রয় রে॥
তোমার কারণে মাহুত সকালে ধুইসুঁ গাও
খাসি মারিয়া রসাই করিসুঁ ভাতো খায়া যাও
না খাই তোমার ভাতো কন্যা হে শ্বশুরে দিবে গালি
বাবা আসিলে বলিয়া দিবো শিয়ালে মারিসে খাসি॥
ভাতো না খাইতে মাহুত রে, মুখে দিলেন পান
ঘরে থাকিতে নিদয় মাহুত আইলাইলেন পরাণ

সকালেই উঠিয়া কইন্যা মুখ দেখিনু কার হুকুম হইল যাইতে রায়মানায় শিকার
কি কথা কহিলেন মাহুত রে মাহুত না কহিও আর
তোমার বিনা এই পিলখানা হইবে অন্ধকার॥

(বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং-৯৮)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

হাতি বান্ধিস হাতি ছান্দিস রে মাহুত
হাতির ঝাড়িয়া ধুলা
সইত্য করি কও মাহুত, কোনঠে তোমার ধুরা॥
হাতি বান্ধো হাতি ছান্দো,
কইন্যা হাতির ঝড়ো ধুলা
সইত্য করি কইলাম
কইন্যা নদীর পাড়ত ধুরা॥
হাতি বান্দিস, হাতি ছান্দিস রে মাহুত হাতিক নাগা দড়ি
সইত্য করি কও মাহুত, তোর বাড়িত কয় ঝোন নারী॥
হাতি বান্দো, হাতি ছান্দো, কইন্যা
হাতিক নাগাও বেড়ি
সইত্য করি কইলাম কইন্যা বিয়াও নাহি করি॥

(প্রান্ত: উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃষ্ঠা নং-৪৮৯- এ উল্লেখ করা হয়েছে, নির্মলেন্দু ভৌমিক বিরুয়া বা মাহুত বন্ধুর গান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিরুয়া শব্দের অর্থ জঙ্গল। তরাই অঞ্চলে হাতির শিকারিকে ফান্দি বলা হয়ে থাকে।)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

না যান, না যান, না যান মাহুত রে
মাহুত বাড়িতে বহে রে হাল
ভালে না হয় হাতির চাকিরি, সাথে সাথে কা
বাপো ভাইয়ে নাই শিখায় কইন্যা রে হালা বাহিবারে॥

কেইনং থাকিমো কইন্যা তোমা বাসরে
না কান্দো, না কান্দো যে, ভাঙ্গিবে অসের গালা
খোদায় যদি ফিরিয়া আনে সোনায় বান্দিম গালা॥

তোরষা নদীর পারে পারে রে মাহুত তোমার চরাণ হাতি
তুই মাহুতের গুণো শনিয়া আমরা দিলাম জাতি
জাতি দিন কুলো দিনু রে মাহুত, তোমার নাগিয়া
এলায় কেনে ছাড়িয়া যাছেন নিদয় হইয়া
ছয়ো মাসো থাকো কইন্যা হে, বাপে ভাইয়ের ঘরে
ফিরিয়া আসিমো কইন্যা হে, ছয়ো মাসো পরে॥

(সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীতঃ ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ৯৯)

ভাওয়াইয়া
রচনা : সংগ্রহ
সুর : প্রচলিত

আমার বাড়ি যান, ও মোর প্রাণের মইষাল রে
ও মইষাল বইসতে দিবো মোড়া
বুকোত বইসতে দিবো মোড়া
বুকোত হেলানি দিয়া রে,
ও মইষাল বাজাইবেন দোতরা॥
আমার বাড়ি যান, ও মোর প্রাণের মইষাল রে
ও মইষাল বইসতে দিবো পিঁড়া
জলপান করিয়া দিবো রে
ও মইষাল সরু ধানের চিড়া
সরু ধানর চিড়া ও হো রে॥
ও মইষাল বিরম ধানের খই
ঘরে আছে চাম্পা কল্লা রে মইষাল
মইষাল গামছা বান্ধা দই
একে গাছের গুয়া মোর প্রাণের মইষাল রে॥
মইষাল একে গাছের পান
কি করিয়া খোয়াইলেন গুয়া রে
ও মাইষাল ঘরে না রয় মন॥
ভার বান্দ মোর ভারাটি বান্দ রে
ও মইষাল ভইষের পিঠে জিন
আজি কেনে দেখোঙ মইষাল রে
তোমার ছাড়িয়া যাবান চিন॥

(ছাতি-বু, ধুয়া- মৈষের বাথান, ভারাট- বোঁচকা, কিল্লা-খুটি। সূত্রঃ বাংলা লোকসঙ্গীত: ভাওয়াইয়া পৃষ্ঠা নং ১০০)

ভাওয়াইয়ার গান প্রথম দিকে যারা সমাজের প্রতিকূল পরিবেশেও চর্চা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, কাজী মকবুল হোসেন, আব্দুল করিম, অন্ধ টগর, আলাউদ্দিন আহমেদ, নায়েব আলী টেপু, খান পাতার, তুলসী লাহিড়ী, সুরেন্দ্র নাথ বসুনীয়া, কেশব চন্দ্র বর্ম্মন, স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র পাল, যত্নেশ্বর বর্মণ, ধনেশ্বর রায়, বিরজা মোহন সেন, প্যারামোহন দাস, গ্যারী বর্ম্মন, স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র সরকার, প্রতিমা বড়ুয়া। আরও পরে যারা চর্চা করেছেন মকবুল আলী, হরলাল রায়, কানাইলাল শীল, মহেশ চন্দ্র রায়, মোঃ কছিমুদ্দিন, শ্রী রথীন্দ্র নাথ রায়, মোস্তফা জামান আব্বাসী, নাদিরা বেগম, ফেরদৌসী রহমান, শিরীফা রাণী, মোঃ সিরাজ উদ্দিন, চিন্তাহরণ রায়, ইন্দু বালা, আঙ্গুর বালা, মমতাজ মোস্তফা, আব্দুল রহিম মালিথা, হাফিজুর রহমান, খবির উদ্দিন, আজিজুল ইসলাম গোলাম আম্বিয়া, শিবনাথ দাস, বিজয়া রায়, শাহিদা বেগম, শ্যামাপদ বর্মণ, মোঃ শাহজাহান, পরিমল চন্দ্র বর্মন, শহীদুজ্জামান, বদিয়ার রহমান, কাজলী আহমেদ প্রমুখ। এখনো যারা চর্চা করেন বা করেছেন তাদের নাম দেয়া হলো

পশ্চিমবঙ্গ ভারত

শ্রীমতি নীহার বরুয়া, শ্রী দেশবন্ধু চক্রবর্ত্তী, শ্রী কেদার চক্রবর্ত্তী, শ্রী সুশীল চন্দ্র রায়, শ্রী নারায়ণ রায়, কুমার অনিল নারায়ণ, কুমার নিধি নারায়ণ, শ্রী গঙ্গাধর দাস, শ্রী পানিয়া রায়, শ্রী সুনীল দাস, শ্রী নরেণ পাল, মোঃ আজিমুদ্দিন, শ্রীমতি সুনীতি রায়, আয়েসা সরকার, শ্রীমতি দময়ন্তি রায়, শ্রী কালী দাস গুপ্ত, স্বপন বসু, শ্রী মতি আলপনা গুপ্ত, শ্রী উত্তম দাস, শ্রী সিদ্ধেশ্বর রায়, শ্রী যোগেন বর্মণ, শ্রীমতি দীপ্তি রায়, শ্রী শ্যামাপদ রায়, শ্রী সুশীল চন্দ্র রায়, শ্রী হরিপদ দে, শ্রী সুনীল দাস, শ্রী নগেন শীল, শ্রী নরেণ বর্মণ, শ্রী কালী দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশ রায় ও নূরজাহান বেগম।

কুড়িগ্রাম

১. মরহুম কাজী মকবুল হোসেন, পাটশ্বেরী কুড়িগ্রাম
২. মরহুম কছিম উদ্দিন, নতুন শহর, কুড়িগ্রাম
৩. মরহুম গোংড়া দোয়ারী, হরিকেশ, কুড়িগ্রাম
৪. মোঃ জাহের আলী, পুরাতন স্টেশন, কুড়িগ্রাম
৫. বাবু অনন্ত কুমার দেব, কাঁঠালবাড়ি, কুড়িগ্রাম
৬. নুরল ইসলাম জাহিদ, থানা পাড়া, কুড়িগ্রাম
৭. সুবেদার আব্দুল মজিদ, রৌমারী, কুড়িগ্রাম
৮. কে এম শাহানুর রহমান শানু, সবুজপাড়া, কুড়িগ্রাম
৯. শ্রী রুপু মজুমদার, উলিপুর কুড়িগ্রাম

১০. মোছাঃ নাসিমা বেগম লাকী, নতুন শহর, কুড়িগ্রাম
১১. শ্রী ভুপতি ভূষণ বর্ম্মা দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
১২. মোঃ শফিকুল ইসলাম শফি, কাঁঠালবাড়ি, কুড়িগ্রাম
১৩. মোঃ তোফায়েল মানিক সঙ্গীত শিক্ষক, দাশেরহাট স্কুল, কুড়িগ্রাম
১৪. মোঃ মাজিদুল ইসলাম খোকন, পাটেশ্বরী ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
১৫. মোছাঃ আছমা বেগম, পাটেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
১৬. মোছাঃ নুরন্নাহার বেগম, কাঁঠালবাড়ি, কুড়িগ্রাম
১৭. শ্রী নির্মল কুমার দে, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১৮. শ্রী বসন্ত কুমার, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
১৯. মোঃ নূরল আমীন লাবু, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২০. নাসরীন আমীন লাভলী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২১. শ্রী চন্দ্রজিত কুমার রায়, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
২২. শ্রী অনিল চন্দ্র সরকার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
২৩. নূর মোহাম্মদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
২৪. শ্রীমতি নমিতা রায়, সিন্দুরমতি, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
২৫. শ্রী দীপ্তি রাণী রায়, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
২৬. মঞ্জুমান আরা লাভলী, পশ্চিম নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২৭. জাহাঙ্গীর হোসেন জেহাদ, বাসষ্ট্যান্ড, কুড়িগ্রাম
২৮. মিস বিউটি, প্রযত্নে নেজামুল হক বিলু, পুরাতন স্টেশন, কুড়িগ্রাম
২৯. পঞ্চানন রায়, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৩০. নারায়ণ চন্দ্র, কাঁঠালবাড়ি, কুড়িগ্রাম
৩১. শ্রী ভবতরণ রায়, চিলমারী, কুড়িগ্রাম
৩২. শ্রী জগদীশ চন্দ্র, চিলমারী, কুড়িগ্রাম
৩৩. মোছাঃ খালেদা বেগম, কৃষ্ণপুর, কুড়িগ্রাম
৩৪. জগৎ পতি বর্মা, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৩৫. মিসেস ফাতেমা জান্নাত মিনা, ফকির মামুদ, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম
৩৬. মোছাঃ লাভলী বেগম, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
৩৭. মোঃ হাবিল উদ্দিন, জানুয়ারচর, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম
৩৮. মোঃ শাহ আলম, কাচারী পাড়া, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম
৩৯. আবুল হোসেন বয়াতী, টাঙ্গালী পাড়া, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম
৪০. জীবন চন্দ্র পাল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৪১. কল্লোল কুমার দেব, দেবালয়, ডাকঘর : কাঠালবাড়ী, কুড়িগ্রাম
৪২. কুমারী সুমী রাণি দেব, দেবালয়, ডাকঘর : কাঠালবাড়ী, কুড়িগ্রাম
৪৩. সাথী রাণী রায়, মতিনেরহাট, কুড়িগ্রাম
৪৪. কুমারী সাবানা মণ্ডল, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৪৫. পলী রাণী রায়, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৪৬. মোঃ সাব্দার আলী, বেগমগঞ্জ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৪৭. মাহবুবা আখতার দয়া, ঘরিয়ালডাঙ্গা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

৪৮. মোঃ নাজমুল হুদা, ঘরিয়ালডাঙ্গা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৪৯. শুকারু সরকার, নাককাটি বাজার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৫০. শ্রীমতি রীতারাণী দেব, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৫১. আব্দুল কাফি, হরিশ্বর, তালুক রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৫২. কৃপা সিন্দু রায় রতিগ্রাম, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৫৩. গোলাম মোস্তফা বাবুল, বাসস্ট্যান্ড, কুড়িগ্রাম
৫৪. শ্রী অনিল চন্দ্র সরকার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৫৫. বিজরী আক্তার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৫৬. অধীর চন্দ্র বর্মা, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৫৭. কুমারী চিত্রলেখা বর্মা, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৫৮. তৈয়বুর রহমান, পাটেশ্বরী, ভুরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
৫৯. আবু সাইদ মোল্লা, বেগমগঞ্জ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৬০. বাবুল হোসেন, থানাঘাট, ভুরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
৬১. মোঃ তছলিম উদ্দিন, থানাঘাট, ভুরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
৬২. তোফাজ্জল হোসেন, থানাঘাট, ভুরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
৬৩. নুরুল ইসলাম, থানাঘাট, ভুরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
৬৪. আব্দুস ছালাম, বারজানী, ভুরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
৬৫. মোছাঃ নার্গিস বেগম, পাটেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
৬৬. রুহুল আমীন, রায়গঞ্জ, কুড়িগ্রাম
৬৭. তাপসী রায়, রাজারহাট. কুড়িগ্রাম
৬৮. মোঃ শাহ আলম খন্দকার, দুর্গাপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৬৯. শ্রী গজেন্দ্র নাথ মোহন্ত, ঘড়িয়াল ডাঙ্গা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৭০. কুমারী ময়ূরী ঘোষ, নাজিমখাঁন, রাজারহাট কুড়িগ্রাম
৭১. শ্রীমতি অনুরূপা রায়, সূরধ্বণী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৭২. সুজন রায়, দুর্গ.পুর, কুড়িগ্রাম
৭৩. শ্রী নন্দ রায়, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৭৪. শ্রী সবুজ রায়, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৭৫. নবীন হোসেন, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৭৬. সীমা রাণী, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৭৭. শ্রী বিশ্বনাথ রায়, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৭৮. কুমারী দীপিকা রায়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৭৯. শ্রীমতি মিনি রায়, সিন্দুরমতি, সঞ্চয়ী গোষ্ঠী, রাজারহাট , কুড়িগ্রাম
৮০. মোঃ ইউনুস আলী, সুরধ্বনী রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮১. খায়রুল ইসলাম, সঞ্চয়ী গোষ্ঠী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮২. শ্রী যত্নেশ্বর রায়, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৮৩. শ্রী মানিক লাল, সঞ্চয়ী গোষ্ঠী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮৪. শ্রী সুদর্শন মোহন্ত, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮৫. মে আইয়ুব আলী, সঞ্চয়ী গোষ্ঠী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

৮৬. শ্রী নৃপেন্দ নাথ রায়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮৭. শ্রী সুবীর নন্দী, সুরধ্বনী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮৮. শ্রী জগন্ময় রায় ঈশোর, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৮৯. মোঃ কলি বেগম প্রযত্নে. মরহুম কছিমুদ্দিন, কুড়িগ্রাম
৯০. মোঃ ইউনুস আলী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৯১. মোঃ আমিনুল ইসলাম, কাঠালবাড়ি, কুড়িগ্রাম
৯২. ফারহানা শাহরীন প্রভা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
৯৩. কুমারী কৃষ্ণা রাণী রায় (শিল্পী), রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৯৪. প্রীতিলতা রায়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৯৫. দীপ্তিরায়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৯৬. শিউলী দেবনাথ, ঘড়িয়ালডাঙ্গী, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৯৭. সুনীল চন্দ্র রায়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
৯৮. মোঃ আনোয়ারুল কবীর, নাজিম খাঁ, কুড়িগ্রাম
৯৯. পরেশ চন্দ্র রায়, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০০. মোঃ সোলায়মান, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০১. মোঃ মজিবুর রহমান, কালুডাঙ্গা উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০২. সামসুল আলম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০৩. অন্যান্যা চক্রবর্তী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০৪. শেফালী রাণী রায়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম
১০৫. মৌমিতা মজুমদার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০৬. সাজু আইমেদ, কুড়িগ্রাম
১০৭. এস এম রোকনুদৌলা মনা, নারিকেলবাড়ি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম
১০৮. মোঃ তাজুল ইসলাম. কুলেজপাড়া, কুড়িগ্রাম
১০৯. খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট, নতুন শহর, কুড়িগ্রাম
১১০. ঝর্না আকতার হাসী, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১১. হাফিজুর রহমান বাবু নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১২. মোস্তফিজুর রহমান বকুল নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১৩. মলি, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
১১৪. শফি, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১৫. রেখা, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১৬. জেলিন, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১৭. তন্বী, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১৮. লেলিন, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১১৯. পারুল, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১২০. জাহাঙ্গীর, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১২১. ফারুখ, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
১২২. লিংকন, কাঠালবাড়ী কুড়িগ্রাম
১২৩. নবীন, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম

লালমণিরহাট

১. মোঃ শমশের আলী প্রধান, জগৎবেড়, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
২. মোঃ জমশের আলী, খোদ্দসাপটানা, লালমণিরহাট
৩. বেগম সুরাইয়া বেলী, লোহাখুচি, লালমণিরহাট
৪. ধীরেন্দ্র নাথ দাশ, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
৫. রাওয়ানা মার্জিয়া, খোদ্দসাপটানা, লালমণিরহাট
৬. মোঃ বাদশা আলম, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
৭. মোঃ রওশন আলী প্রধান, জগৎবেড়, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
৮. মোঃ নূরুল ইসলাম ফরমানী, জগৎবেড়, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
৯. শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দাস, জগৎবেড়, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
১০. মোঃ সাহাজ উদ্দিন বয়াতী, জগৎবেড়, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
১১. শ্রীমতি দুলালী রায়, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
১২. শ্রী উপেন্দ্রনাথ রায়, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
১৩. শ্রী স্মরণ চন্দ্র বর্মণ, সিন্দুরমতি, লালমণিরহাট
১৪. মোছাঃ জোসনা বেগম, সাহেবপাড়া, লালমণিরহাট
১৫. শ্রী জগদীশ চন্দ্র সাপ্টীবাড়ি, লালমণিরহাট
১৬. শ্রী চন্দ্রধর বর্মণ, হাজীগঞ্জ, লালমণিরহাট
১৭. শ্রী রতন কুমার রায়, ভেলাবাড়ি, লালমণিরহাট
১৮. শ্রী কল্যাণ চন্দ্র শীল, চলবলা, লালমণিরহাট
১৯. শ্রী রতন কুমার রায়, রাজপুর লালমণিরহাট
২০. শ্রীমতি কবিতা রাণী চম্পা, আদিতমারী, লালমণিরহাট
২১. শ্রীমতি জুথি রাণী, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
২২. শ্রী মনোরঞ্জন রায়, পঞ্চগ্রাম, লালমণিরহাট
২৩. শ্রী নীলকমল মিশ্র, পঞ্চগ্রাম, লালমণিরহাট
২৪. শ্রী মনীন্দ্র নাথ, হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট
২৫. শ্রী তরণী কান্ত রায়, সিন্দুরমতি, লালমণিরহাট
২৬. কুমারী মাধবী রাণী, রায়, নওদাবস, হাতিবান্ধা
২৭. মোঃ বেবি বেগম, মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট
২৮. মিস বুলবুলি বেগম, মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট
২৯. মোঃ মন্তুবর রহমান বয়াতি, মহিষখোচা, আদিতমারী লালমণিরহাট
৩০. কুমারী কৃষ্ণা রাণী রায়, কাকিনা, লালমণিরহাট
৩১. শ্রী কামিনী কান্ত রায়, ভাদাই, লালমণিরহাট
৩২. শ্রী রুক্ষ্মণী দাশ, ভেলাগুড়ি, লালমণিরহাট
৩৩. শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ, হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট
৩৪. মোছাঃ জান্নাতুল কোবরা বিউটি, হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট
৩৫. মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাবুপাড়া, লালমণিরহাট

৩৬. শ্রী ঠাণ্ডারাম বর্মণ রাজাপুর, লালমণিরহাট
৩৭. শ্রী অবিনাশ চন্দ্র বর্ম্মণ, রাজপুর, লালমণিরহাট
৩৮. শ্রী রীবন্দ্রনাথ রায়, রাজপুর, লালমণিরহাট
৩৯. শ্রী নগেন চন্দ্র বর্ম্মণ, রাজপুর, লালমণিরহাট
৪০. শ্রী রীবন্দ্র, রাজপুর, লালমণিরহাট
৪১. কুমারী শিল্পী রাণী রায়, রাজপুর, লালমণিরহাট
৪২. স্বর্গীয় রজনী বৈরাগী হারাটী, লালমণিরহাট
৪৩. মোঃ রফিকুল ইসলাম, চলবলা, লালমণিরহাট
৪৪. শ্রী রবীন্দ্র নাথ, তুষভাণ্ডার, লালমণিরহাট
৪৫. স্বর্গীয় বীরেশ্বর বর্ম্মণ, কাকিনা, লালমণিরহাট
৪৬. স্বর্গীয় ধনেশ্বর বর্ম্মণ, চলবলা, লালমণিরহাট
৪৭. স্বর্গীয় বীরেশ্বর বর্ম্মণ, চলবলা, লালমণিরহাট
৪৮. শ্রী যোগেশ্বর দোয়ারী, রাজপুর, লালমণিরহাট
৪৯. স্বর্গীয় খোকা দোয়ারী, চলবলা, লালমণিরহাট
৫০. স্বর্গীয় রমণী দোয়ারী, হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট
৫১. শ্রী অনিল চন্দ্র, তুষভাণ্ডার, লালমণিরহাট
৫২. কুমারী মায়া রাণী রায়, তুষভাণ্ডার, লালমণিরহাট
৫৩. শ্রী জগদীশ চন্দ্র রায়, তুষভাণ্ডার, লালমণিরহাট
৫৪. মোঃ রতন মিয়া, লোহাখুচি, লালমণিরহাট
৫৫. সুইটি রাণী রায়, সিন্দুরমতি, লালমণিরহাট
৫৬. এস এম নজরুল ইসলাম, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট
৫৭. অতুল প্রসাদ রায়, আদিতমারী, লালমণিরহাট
৫৮. শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
৫৯. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
৬০. মোছাঃ নুরবানু বেগম, পাঙ্গা, লালমণিরহাট
৬১. সচ্চিদানন্দ রায়, রাজপুর, লালমণিরহাট
৬২. নুরুল ইসলাম সরকার, হাজিগঞ্জ, আদিতমারী, লালমণিরহাট
৬৩. চাঁদমিয়া, তালুক দলালী, আদিতমারী, লালমণিরহাট
৬৪. মতিয়ার রহমান, দুর্গাপুর, আদিতমারী, লালমণিরহাট
৬৫. আমিনুর রহমান, একতা পাড়া, লালমণিরহাট
৬৬. শাহনাজ বেগম লাকী, খেতাবাগ, লালমণিরহাট
৬৭. শরিফা বেগম, কমলাবাড়ী, লালমণিরহাট
৬৮. সান্ত্বনা রাণী, কমলাবাড়ী, লালমণিরহাট
৬৯. সাথী, প্রযত্নে : লিটন, কলেজ রোড, লালমণিরহাট
৭০. শ্রী পূর্ণ চন্দ্র রায়, রাজপুর লালমণিরহাট
৭১. ইসফাত আরা মণি দোয়ানী কলোনী, হাতীবান্দা, লালমণিরহাট
৭২. লিপি বেগম, সদর, লালমণিরহাট

রংপুর

১. মোঃ সিরাজ উদ্দিন বৈরাগী পাড়া, রংপুর
২. মরহুম নমরুদ্দিন আহমেদ (বিশিষ্ট দোতরা বাদক ও শিল্পী), মীরবাগ, রংপুর
৩. শ্রীমতি রাধা রাণী রায়, কারমাইকেল কলেজ, রোড, রংপুর
৪. মোঃ আজিজুল ইসলাম, রংপুর
৫. রওশন আরা সোহেলী, কেরাণীপাড়া, রংপুর
৬. শ্রী বিশ্বনাথ মোহন্ত, মাহিগঞ্জ, রংপুর
৭. রেজেকা সুলতানা ফেন্সী, সদর, রংপুর,
৮. জিনিয়া খান মালা, আদর্শপাড়া, রংপুর
৯. মোঃ রমজান আলী, পাগলাপীর, রংপুর
১০. মোছাঃ রহিমা বেগম, কাউনিয়া, রংপুর
১১. শ্রমতি পল্লবী সরকার, মালতী, মীরবাগ, রংপুর
১২. মোছাঃ মনোয়ারা পারভীন, হারাগাছ, রংপুর
১৩. নন্দ গোপাল রায়, পুলিশ লাইন, রংপুর
১৪. গৌরাঙ্গ কুমার মোহন্ত, সদর, রংপুর
১৫. শ্রী রণজীৎ কুমার রায়, পাগলাপীর, রংপুর
১৬. মোঃ ছোলায়মান, ধাপ, রংপুর
১৭. হারুন অর রশিদ, খলেয়াগঞ্জীপুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর
১৮. মাহমুদা আখতার মিলা, জুম্মাপাড়া, রংপুর
১৯. শচীন্দ্র নাথ রায়, গোমস্তপাড়া, রংপুর
২০. রোখসানা আফরোজা রিক্তা, পাকপাড়া, রংপুর
২১. কুমারী অঞ্জলী রাণী রায়, হাজিরহাট, কাউনিয়া, রংপুব
২২. বাসন্তি রাণী রত্না, হাজিরহাট, কাউনিয়া, রংপুর
২৩. চম্পা পারভীন, হারাগাছ, রংপুর
২৪. মোছাঃ নাদিরা, বেগম, হারাগাছ, রংপুর
২৫. মোর্শেদ জাহান রীমা, গণেশপুর, রংপুর
২৬. সামিউল হাসান লিটন, বাস টার্মিনাল, রংপুর
২৭. পরিমল চন্দ্র বর্মণ, কামালকাছনা, রংপুর
২৮. মোঃ মিনহাজ উদ্দিন আজাদ, বৈরাগী পাড়া, রংপুর
২৯. মিসেস সালমা মোস্তাফিজ, পীরগঞ্জ, রংপুর
৩০. এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, পীরগঞ্জ, রংপুর
৩১. শাহানা আক্তার লেবু, শুকুরের হাট, মিঠাপুকুর, রংপুর
৩২. শ্রী ভগলুচন্দ্র মোহন্ত, মিঠাপুকুর, রংপুর
৩৩. খন্দকার আবুল হোসেন, সাগরপাড়া, রংপুর
৩৪. মোঃ আব্দুল মজিদ, গাড়ালচৌকি, মিঠাপুকুর, রংপুর
৩৫. কুমারী জবা রায়, মুলাটোল, রংপুর

৩৬. মিস শাফরিনা নিশাত, মিথিলা, সদর, রংপুর
৩৭. মিনতি রাণী রায়, গঙ্গাচড়া, রংপুর
৩৮. রুনিরা আক্তার রুনি, পীরগঞ্জ, রংপুর
৩৯. শ্রী সুরেশ চন্দ্র রায়, খলেয়া, রংপুর
৪০. শাপলা সরকার, মিঠাপুকুর, রংপুর
৪১. উম্মে হাবিবা ফারহানা শেলী, ওকড়াবাড়ি, গংগাচড়া, রংপুর
৪২. সাথী সরকার, মাহিগঞ্জ, রংপুর
৪৩. তামান্না, হনুমান তলা, রংপুর
৪৪. সুশান্ত সরকার সুরেশ, বেতগাড়ী, গঙ্গাচড়া, রংপুর
৪৫. হারন-উর-রশিদ, রংপুর ক্যান্ট, রংপুর
৪৬. রিতা রায়, রংপুর
৪৭. নিবারণ চন্দ্র রায়, বাংলাদেশ রাইফেলস, রংপুর
৪৮. অংকন কামাল কাছনা, রংপুর
৪৯. আব্দুল করিম পুলিশ লাইন, রংপুর
৫০. মকবুল হোসেন, কাউনিয়া, রংপুর
৫১. আনিছুর রহমান তাঁতী পাড়া, রংপুর
৫২. অশ্বনী কুমার বৈরাগী পাড়া, রংপুর
৫৩. লুবনা ইয়াসমীন দোয়েল, পাশ রংপুর
৫৪. সাহস মোস্তাফিক, রংপুর
৫৫. প্রিয়াংকা পাল, রংপুর
৫৬. রিতা মহন্ত, বৈরাগি পাড়া, রংপুর
৫৭. তাসলিমা আক্তার নিশি বৈরাগিপাড়া, রংপুর

নীলফামারী

১. শ্রী হরলাল রায়, নীলফামারী
২. শ্রী রথীন্দ্র নাথ রায়, নীলফামারী
৩. শ্রী ফণীভূষণ রায়, বেড়াকুঠি, নীলফামারী
৪. শ্রী কুটু বর্মণ বেড়াকুঠি, নীলফামারী
৫. মিস্ লাইজু চৌধুরী, নীলফামারী
৬. কুমারী বিনোদিনী রায়, হরিণচড়া, ডোমার, নীলফামারী
৭. শ্রী অধীর চন্দ্র রায়, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৮. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৯. মিস রত্না বেগম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১০.শ্রী প্রতাপ চন্দ্র দেবনাথ, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ
১১. শ্রীমতি স্বপ্না রাণী রায়, মাগুরা, নীলফামারী
১২. মোঃ আনছার আলী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১৩. কুমারী কল্পনা রাণী রায়, নীলফামারী

১৪. মোঃ নুরুজ্জামান, নীলফামারী
১৫. মোঃ আব্দুল করিম, নীলফামারী
১৬. হোসনে আরা লিপি, নীলফামারী
১৭. বন্দনা রাণি দেবনাথ, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১৮. ঝর্ণা রাণি রায়, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১৯. লিমন চন্দ্র সরকার, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২০. মিলন কুমার রায়, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২১. হেলেন আক্তার, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২২. শাহানাজ পারভীন শম্পা, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২৩. নাসরিন আক্তার লিনা, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২৪. মাহাবুবা আক্তার মায়া, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২৫. স্বপনা আক্তার, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২৬. দীপালি রানী রায় চাপানি, ডিমলা নীলফামারী
২৭. ভূপত বর্ম্মণ, মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
২৮. শ্যামলী রানী, ঝুনাগাছ চাপানী, ডিমলা নীলফামারী
২৯. সুশীল চন্দ্র রায়, ঝুনাগাছ চাপানী, ডিমলা নীলফামারী
৩০. তমা রানী, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৩১. সুবল চন্দ্র রায়, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৩২. সুধীর চন্দ্র রায়, ঝুনাগাছ চাপালী, নীলফামারী
৩৩. সফিয়ার রহমান, ঝুনাগাছ চাপালী, নীলফামারী

গাইবান্ধা

১. মোঃ শাহনেওয়াজ বাবুল, সদর, গাইবান্ধা
২. মোঃ মাহাবুবার রহমান, ছাকা, সদর, গাইবান্ধা
৩. সরকার মজিবুর রহমান, সদর, গাইবান্ধা
৪. এস এম আমজাদ হোসেন দীপ্তি সদর, গাইবান্ধা
৫. মোঃ আনোয়ারুল হক, সদর, গাইবান্ধা
৬. মোঃ হাফিজার রহমান, পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা
৭. ভবেশচন্দ্র সরকার, কামারপাড়া, গাইবান্ধা
৮. মোঃ আহমেদুল ইসলাম (সঞ্জু), কাশদহ, সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা
৯. রণজিৎ কুমার সরকার লক্ষীপুর গাইবান্ধা
১০. মনোরঞ্জন মোদক, গাইবান্ধা
১১. মোছাঃ তারানা নাজনীন সুমনা, গাইবান্ধা
১২. এম, এ, রউফ, গাইবান্ধা
১৩. রীনা রাণী মজুমদার, গাইবান্ধা
১৪. মোঃ আনোয়ারুল হক মান্না, গাইবান্ধা
১৫. মোঃ মাহাবুবুল আলম টিটু, গাইবান্ধা

১৬. অর্থী রহমান (শিশু শিল্পী),. গাইবান্ধা
১৭. বদিয়ার রহমান, গাইবান্ধা

ঠাকুরগাও

১. মো. শহিদুল ইসলাম, বাজার রোড, ঠাকুরগাঁও
২. নারায়ণ চন্দ্র রায়, ঠাকুরগাঁও
৩. ভূপেন্দ্র নাথ রায়, ঠাকুরগাঁও
৪. আবু সালেক, ঠাকুরগাঁও
৫. অমূল্য রতন রায়, ঠাকুরগাঁও
৬. নারায়ণ চন্দ্র রায়, ঠাকুরগাঁও
৭. সত্য মোহন রায়, ঠাকুরগাঁও
৮. নুরুল ইসলাম দেওয়ান, রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও
৯. সুমী সরকার, সদর, ঠাকুরগাও
১০. শ্রীমতি মিরা রাণী রায়, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
১১. সুশান্ত দাস, ঠাকুরগাঁও
১২. ব্রজেন্দ্র নাথ রায়, রুহিয়া, ঠাকুরগাও
১৩. দীনেশ চন্দ্র রায়, রুহিয়া, ঠাকুরগাও
১৪. শেফালী রাণী রায়, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাও
১৫. পাওলিনা মার্ডি, পীরগঞ্জ ঠাকুরগাও

পঞ্চগড়

১. কুমারী সরলা রাণী রায়, আটোয়ারী, পঞ্চগড়
২. শ্রীমতি স্মরণীকা দাস, বোদা, পঞ্চগড়
৩. সুধীর চন্দ্র রায়, আটোয়ারী, পঞ্চগড়
৪. মোঃ বুলবুল, আটোয়ারী, পঞ্চগড়
৫. প্রহলদ চন্দ্র বর্মন, সদর, পঞ্চগড়
৬. মোছাঃ নাছিমা, সদর, পঞ্চগড়
৭. সুলতানা রাজিয়া, আটোয়ারী, পঞ্চগড়
৮. আঃ রহমান, ভরা নদীর বাঁকে, আটোয়ারী, পঞ্চগড়
৯. কুমারী মামণি রায়, বলরামপুর, পঞ্চগড়
১০. শ্রী বুলেট চন্দ্র রায়, বলরামপুর, পঞ্চগড়
১১. শ্রীমতি ভারতী চন্দ্র রায়, বলরামপুর, পঞ্চগড়
১২. শ্রী শান্ত রাম বর্ম্মণ, বলরামপুর, পঞ্চগড়
১৩ মোছাঃ লুৎফা নাজনীন লতা, সদর, পঞ্চগড়
১৪. এম এ জলিল, পঞ্চগড়

১৫. তাপসী রায় আটোয়ারী পঞ্চগড়

দিনাজপুর

১. মোস্তাফিজুর রহমান ফিজু (এমপি), স্বপ্নপুরী, দিনাজপুব
২. কুমারী তুলসী চক্রবর্ত্তী, চিরির বন্দর,
৩. ওয়াহেদুল ইসলাম, পার্ব্বতীপুর দিনাজপুর

বগুড়া

১. হামিদুল হক রানু, সদর, বগুড়া
২. অজিত কুমার কাজল, বগুড়া
৩. এ কে এম আব্দুল আজিজ, বগুড়া
৪. রইস উদ্দিন খন্দকার, জয়পুরহাট, বগুড়া
৫. রোকছানা পারভীন, জয়পুরহাট, বগুড়া
৬. তামান্না ইয়াসমীন, জয়পুরহাট, বগুড়া
৭. সৈয়দ গোলাম আম্বিয়া, জয়পুরহাট, বগুড়া

রাজশাহী

১. দায়দ আল রাহী, রাজশাহী
২. মীনা রব, রাজশাহী
৩. নিলুফার রেজা, রাজশাহী

যশোর

১. হাফিজুর রহমান, যশোর
২. সরজিত রায়, যশোর

সারা বাংলাদেশের যারা দোতরা চর্চা করেছেন বা করে থাকেন

১. শ্রী কানাই লাল শীল, ঢাকা
২. মোঃ নমরুদ্দিন আহমেদ (বিশিষ্ট দোতরা বাদক ও শিল্পী) মীরবাগ, রংপুর
৩. নৃপেন্দ্র নাথ সরকার, ধাপেরহাট, রংপুর
৪. নুরুজ্জামান মিয়া, (বাংলাদেশ বেতার) ধাপ, রংপুর
৫. বিভীষন বর্ম্মণ, ভাইয়ারহাট, রংপুর
৬. শ্রী অধীর চন্দ্র বর্মা, দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম
৭. আব্দুর রউফ, ধাপেরহাট, রংপুর

৮. মোঃ মনিরুজ্জামান, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট
৯. শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
১০. শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
১১. শ্রী ঠাণ্ডারাম বর্মণ, (বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও) রাজপুর, লালমণিরহাট
১২. মায়েদুল ইসলাম, খলেয়াগঞ্জিপুর, পাগলাপীর, রংপুর
১৩. তছলিম উদ্দিন, পাটেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
১৪. রফিকুল ইসলাম, কাউনিয়া, রংপুর
১৫. সগির উদ্দিন বয়াতী, (বাংলাদেশ বেতার) মহিপুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর
১৬. মকবুল হোসেন, কাউনিয়া, রংপুর
১৭. অশ্বণি কুমার, বৈরাগিপাড়া, রংপুর
১৮. স্বর্গীয় গজেন্দ্র নাথ বর্মণ, মাহিগঞ্জ, রংপুর
১৯. মোঃ মোকাদ্দেস আলী, উত্তম, রংপুর
২০. আব্দুর রউফ, চট্টগ্রাম বেতার, রংপুর, চট্টগ্রাম
২১. শ্রী বাবুল কিশোর, চট্টগ্রাম বেতার, চট্টগ্রাম
২২. সুন্দর আলী, চট্টগ্রাম বেতার, চট্টগ্রাম
২৩. আবুল হোসেন, রাজশাহী বেতার, রাজশাহী
২৪. শ্রী অবিনাশ শীল, ঢাকা বেতার, ঢাকা
২৫. মোঃ দেলওয়ার হোসেন, ঢাকা বেতার ঢাকা
২৬. শ্রী রতন শীল, ঢাকা বেতার, ঢাকা
২৭. ভগলু চন্দ্র মোহন্ত, মিঠাপুকুর, রংপুর
২৮. কুটু বর্ম্মন, সৈয়দপুর, নীলফামারী
২৯. মোঃ সোলায়মান, রংপুর বেতার, রংপুর
৩০. শ্রী অভিনাশ চন্দ্র রংপুর বেতার, রংপুর
৩১. আনিছুর রহমান আনিস, বাসস্টান্ড রংপুর
৩২. সুবল চন্দ্র, কিশোরগঞ্জ নীলফামারী

ভাওয়াইয়া গানের গীতিকার

১. আব্দুল করিম (ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দীনের ছোটভাই), ঢাকা
২. শ্রী হরলাল রায়, নীলফামারী
৩. শ্রী মহেশ চন্দ্র রায়, নীলফামারী
৪. মোঃ কছিমুদ্দিন, নতুন শহর, কুড়িগ্রাম
৫. মোঃ সিরাজ উদ্দিন, বৈরাগীপাড়া, রংপুর
৬. মোঃ শমসের আলী প্রধান, জগৎবেড়, পাটগ্রাম
৭. এ কে এম আব্দুল আজিজ, জয়পুরহাট, বগুড়া
৮. শ্রী রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, পঞ্চগ্রাম, লালমণিরহাট

৯. মিসেস মনোয়ারা বেগম, (আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার), রংপুর
১০. এস এম সামীয়ুল ইসলাম, বেলকা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
১১. আব্দুস সাত্তার মাস্টার, হালাবট, কুড়িগ্রাম
১২. মোঃ নুরুল ইসলাম জাহিদ, পুরাতন শহর, কুড়িগ্রাম
১৩. মোঃ হোসেন আলী মংলা, পুরাতন ষ্টেশন, কুড়িগ্রাম
১৪. শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বড়বাড়ি, লালমণিরহাট
১৫. শ্রী নীল কমল মিশ্র, পঞ্চগ্রাম, লালমণিরহাট
১৬. এস এম খলিল বাবু, দর্শনা, রংপুর
১৭. কে এস এম আনোয়ার হোসেন, নিউ আদর্শ পাড়া, রংপুর
১৮. মোঃ নূরল আমীন, পীরগঞ্জ, রংপুর
১৯. খন্দকার সাইদুর রহমান, চিলমারী, কুড়িগ্রাম
২০. মোহাম্মদ শাহ আলম, কামারপাড়া, রংপুর
২১. মোঃ আজিজার রহমান আজিজ, উপশহর, রংপুর
২২. এ কে এম মোস্তাফিজার রহমান, মিঠাপুকুর. রংপুর
২৩. মোঃ মোস্তাফিজার ফিজু নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
২৪. মোঃ নূরুল ইসলাম, কলেজ রোড, রংপুর
২৫. আবু জাফর সাবু, ডেভিট কোং পাড়া, গাইবান্ধা
২৬. মনোয়ারা সুলতানা, গাইবান্ধা
২৭. শাহ্ আলী সরকার, সাগহাটা, গাইবান্ধা
২৮. খন্দকার শাহ আলম, দুর্গাপুর
২৯. আজিজার রহমান আজিজ, টার্মিলাল, রংপুর
৩০. সুনীল সরকার, পাগলাপীর, রংপুর
৩১. সামিউল হাসান লিটন, রংপুর
৩২. খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট, নতুন শহর, কুড়িগ্রাম

সহায়ক গ্রন্থ :

১.	বাঙ্গালীর ইতিহাস	ড. নীহার রঞ্জন রায়
২.	জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য	ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
৩.	Tribes and Casts of Bengal	Mr Resly
৪.	Cooch Behar state and land Revenue settlement	Harendra Nath Chaudhury
৫.	কোচবিহারের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮)	শ্রী হেমন্ত কুমার বর্ম্মা এম এ বি এল
৬.	বাঙলা ভাষার ইতিহাস	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
৭.	মধুপর্ণী (বিশেষ কোচ বিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬)- সংখ্যা সম্পাদক :	সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য

	আনন্দ গোপাল ঘোষ	
৮.	কোচবিহার লোকাচার	ধর্মনারায়ণ বর্মা
৯.	লোকসঙ্গীত কোচবিহার	সুখ বিলাস বর্মা
১০.	মৈষাল বন্ধুর গান	ফণী পাল
১১.	স্মারক গ্রন্থ ৫৪ তম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ জলপাইগুড়ি	সভাপতি, শ্রী রবীন্দ্র নাথ, সাধারণ সম্পাদক, ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ
১২.	ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সমাজ চিত্র	ডা. বিজয় ভূষণ রায়
১৩.	কুড়িগ্রামের ইতিহাস	সাপ্তাহিক ধরলা, কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত
১৪.	মাটির সুর ভাওয়াইয়া	সাপ্তাহিক অটল, রংপুর থেকে প্রকাশিত
১৫.	আমার শিল্পী জীবনের কথা	আব্বাস উদ্দিন আহমেদ
১৬.	রংপুরের লোক সাহিত্য	মোঃ আব্দুল আজিজ (অভিযাত্রিক, রংপুর থেকে প্রকাশিত ১৪ সংখ্যা আশ্বিন ১৪০৫)
১৭.	মেঠো সুরের দিগন্ত : ভাওয়াইয়া	মোস্তফা জামান আব্বাসী (বেতার বাংলা)
১৮.	ভারতীয় সংগীত ইতিহাস	সুকুমার রায়
১৯.	কোচবিহারের ইতিহাস	খান চৌধুরী আমানতুল্লা
২০.	বাংলাদেশের লোক সংগীত ও ভৌগলিক পরিবেশ	হাবিবুর রহমান
২১.	রংপুরের অধিবাসী নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	সমর পাল
২২.	কুড়িগ্রামের ইতিহাস	তোফায়েল আহমেদ
২৩.	বাঙ্গালার ইতিহাস	রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়
২৪.	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান	সম্পাদক : সেলিম রেজা
২৫.	উত্তর বঙ্গ পল্লীগীতি	হরিশ চন্দ্র পাল
২৬.	বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য	ড. দীনেশ চন্দ্র সেন
২৭.	বাংলা লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া	ওয়াকিল আহমেদ
২৮.	উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য	শিশির মজুমদার
২৯.	বৌদ্ধ গান ও দোঁহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত
৩০.	আব্বাস উদ্দিনের গান	মোস্তফা কামাল, মুস্তফা জামান আব্বাসী, ফেরদৌসী রহমান
৩১.	লোকসঙ্গীত-স্বরলিপি	